একাত্তর করতলে ছিন্নমাথা

হাসান আজিজুল হক

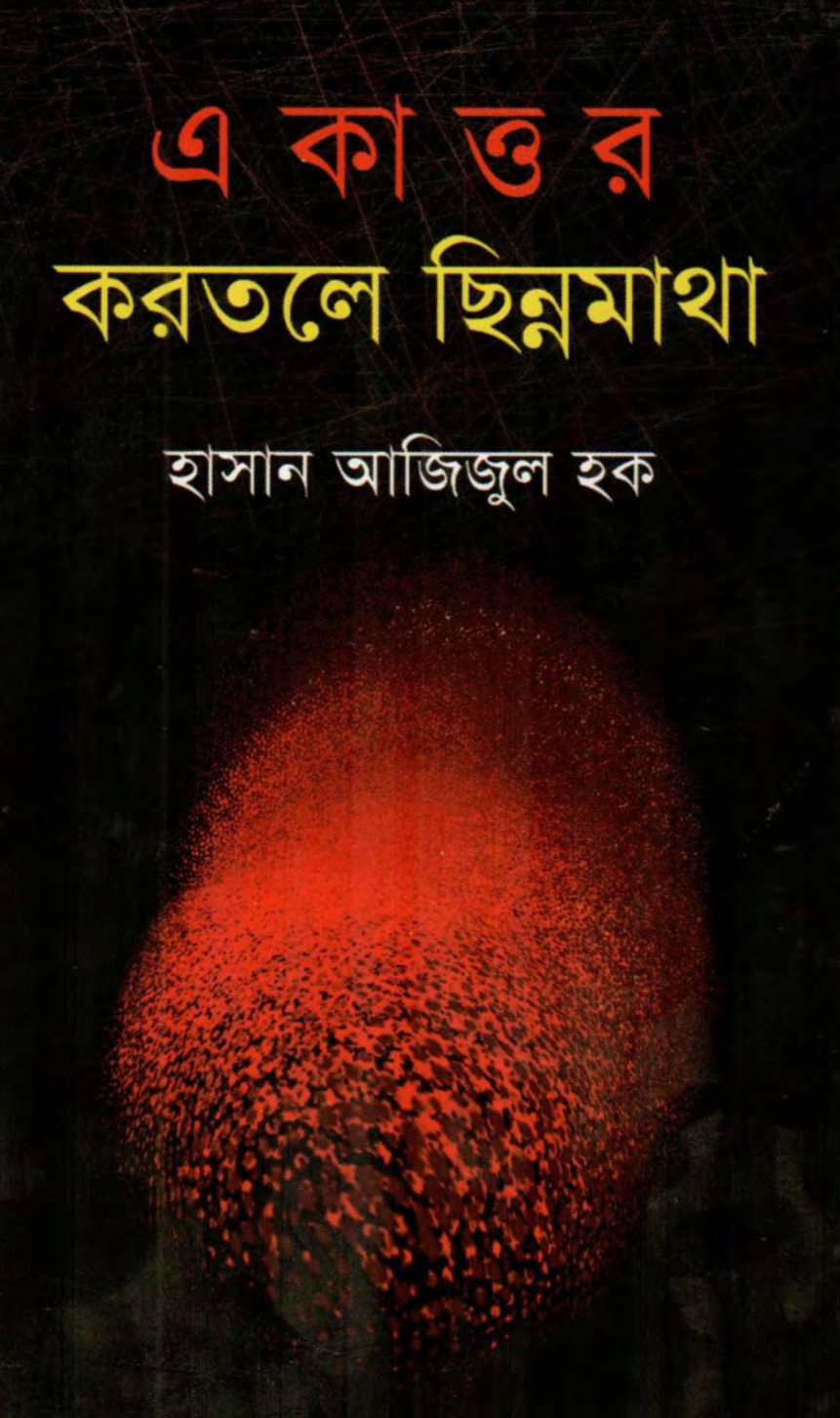

আমাদের কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক যখন আমাদের ইতিহাসের মহত্তম ঘটনায় শরিক থাকার অভিজ্ঞতা বর্ণনায় অগ্রসর হন, তখন নিঃসন্দেহে গভীরতর ব্যঞ্জনা নিয়ে ফুটে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা। কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক তাঁর দেখা একাত্তরের ভাষ্য শুরু করেছেন নিস্পৃহ নিরাবেগ ভঙ্গিতে। বইয়ের সূচনাবাক্যে তিনি লিখেছেন : *'আমার জানা ছিল না যে পানিতে ভাসিয়ে দিলে পুরুষের লাশ চিৎ হয়ে ভাসে আর নারীর লাশ ভাসে উপুড় হয়ে। এই জ্ঞান আমি পাই '৭১ সালের মার্চ মাসের একেবারে শেষে।'* জীবনের নিষ্ঠুরতার বর্ণনায় এমনি অসাধারণ সংযমী শিল্পদৃষ্টির প্রকাশ আমাদের এক লহমায় দাঁড় করিয়ে দেয় কঠিন সত্যরূপের মুখোমুখি। শক্তিমান লেখকের সংহত জীবনদৃষ্টি এমনিভাবেই পরতে পরতে উদ্ভাসিত হয়েছে এই গ্রন্থে। একান্ত ব্যক্তিগত ছোট-বড় সাধারণ অভিজ্ঞতাসমূহ শিল্পের পুণ্যস্পর্শে তিনি করে তুলেছেন সর্বকালীন ও সর্বজনীন। শিল্পী অশোক কর্মকারের তুলিস্পর্শে নতুনভাবে বিন্যস্ত এই সংস্করণ পাঠকের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে গ্রন্থের পাঠ আরো নিবিড় করবার লক্ষ্য নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অজস্র বইয়ের ভিড়ে তাই উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে অনায়াসে চিহ্নিত হবে এই গ্রন্থ।

ISBN 984465070-4
9 789844 650701

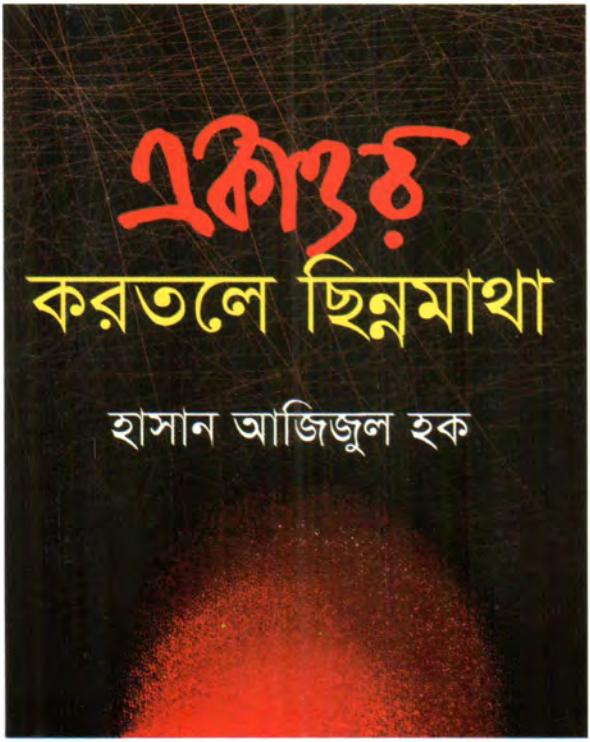

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

সাহিত্য প্রকাশ

প্রচ্ছদ ও গ্রন্থচিত্রণ : অশোক কর্মকার
তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৪, অগ্রহায়ণ ১৪২১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৯৯, অগ্রহায়ণ ১৪০৬
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, ফাল্গুন ১৪০১
ISBN 984-465-070-4

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা

প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০
হরফ বিন্যাস : কম্পিউটার প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০
মুদ্রক : কমলা প্রিন্টার্স, ৪২ তোপখানা রোড, ঢাকা ১০০০

উৎসর্গ

একাত্তরের শহীদ

খালেদ রশীদের স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলোকে কালানুক্রমে সাজানো হলেও সেগুলো কিন্তু টানা লেখা নয়। টুকরো, আলাদা আলাদা লেখা হিসেবেই এরা রচিত হয়েছিল, প্রত্যেকটি লেখার আলাদা শিরোনাম ছিল এবং সেই শিরোনাম নিয়েই এরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাকালের ব্যাপারেও অগ্রপশ্চাতের হিশাব মিলবে না। বেশিরভাগ লেখাই বিজয় দিবস উপলক্ষে রচিত বলে একাত্তরের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা নিয়ে লেখার সংখ্যা বেশি, লিখছিও অনেক আগে থেকে, আশির দশকের শুরু থেকে সম্ভবত অথচ একাত্তরের মার্চ-এপ্রিল-মে মাসের ঘটনা নিয়ে লেখা রচনাগুলো হয়তো খুবই হালের। রফিকে নিয়ে লিখেছি বছরখানেক আগে। খালেদ রশীদ সম্পর্কে লেখাটি কয়েক বছর আগে *স্মৃতি* '৭১ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'তিনি ফিরে এসেছিলেন' নামে একাত্তরের মে মাসের ঘটনা নিয়ে লেখাটি তো প্রকাশিত হয়েছে '৯৪ সালের ডিসেম্বরের বিজয় দিবসে।

বইটির মধ্যে, কাজেই কোনো নিরবচ্ছিন্ন সমগ্রতা থাকার কথা নয়, তা নেইও, মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে একটি টানা লেখায় যা থাকা সম্ভব। তবু লেখাগুলোকে সাজানোর সময় একটা কালানুক্রম অনুসরণ করা হয়েছে। যাতে একটা সমগ্রতার আদল দেখা দেয় সেজন্য শিরোনামগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে।

এই একই কারণে অর্থাৎ একটানা না হয়ে টুকরো টুকরো লেখা হওয়ার ফলে পুনরুক্তি এড়ানো সম্ভব হয়নি। পরপর দু'বছর বিজয় দিবসে দুটি আলাদা লেখা লিখতে গেলে পুনরুক্তি এড়িয়ে চলা খুবই কঠিন। সেজন্য লেখাগুলোকে ছাঁটকাট করতে হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের ঘটনা নিয়ে লেখা আমার দু'একটি গল্পের বিন্যাস, ভাষা ইত্যাদি এই বইয়ের কোনো কোনো লেখার সঙ্গে অবিকল মিলে গেছে অথচ লেখার সময় আমি কখনো এদের মিলিয়ে দেখিনি। আসল কথা, অভিজ্ঞতার বাইরে আমার উদ্ভাবনী ক্ষমতা শূন্য।

আর একটি মজার কথা। একাত্তরের ঘটনা নিয়ে ২০-২২ বছর পরের লেখা কেমন দাঁড়াবে। অনুভবগুলো অবিকৃত থাকবে কি? প্রথম বিজয় দিবসের উত্তাল উন্মাদনার ছবি '৯৪-এর বিজয় দিবসে আঁকতে গেলে '৯৪-এর ক্লিন্ন নিঃস্ব, স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তির দম্ভে উপদ্রুত বাংলাদেশের ছায়া তার ওপর পড়ছে নাকি? তা যাতে না ঘটে, ভাবনা অনুভব যাতে অবিকৃত থাকে, সেজন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। ডায়েরি থাকলে খানিকটা সাহায্য হয়। রফি বা এইরকম আরও দু'একটি লেখাতে ডায়েরির সাহায্য পাওয়া গেছে। আমি সাধারণত ডায়েরি লিখি না।

সাহিত্য প্রকাশের স্বত্বাধিকারী প্রীতিভাজন মফিদুল হক অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রকাশ করলেন, এজন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জনাই।

হাসান আজিজুল হক

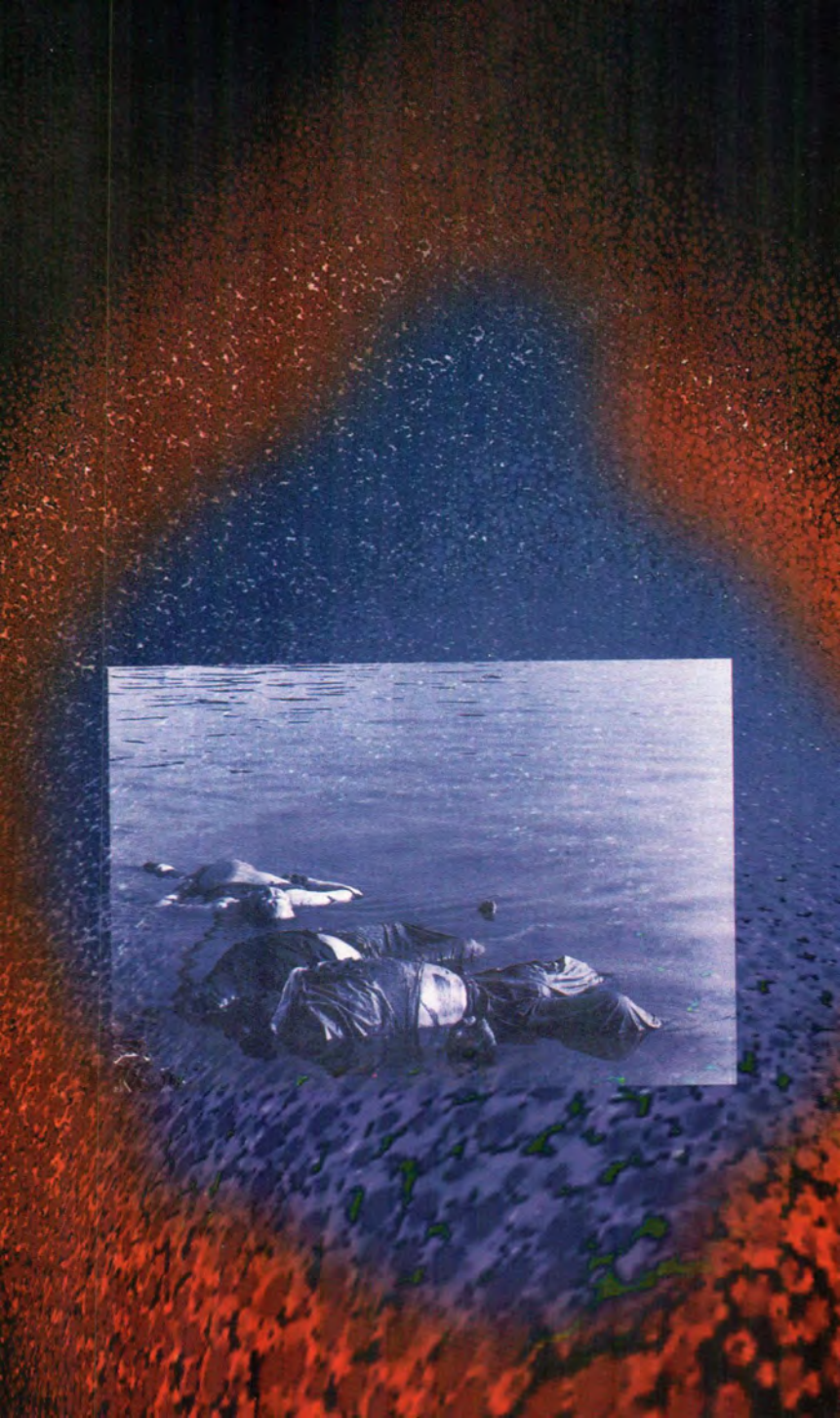

আমার জানা ছিল না যে

পানিতে ভাসিয়ে দিলে পুরুষের লাশ চিৎ হয়ে ভাসে আর নারীর লাশ ভাসে উপুড় হয়ে। মৃত্যুর পরে পানিতে এদের মধ্যে এইটুকু তফাত। এই জ্ঞান আমি পাই '৭১ সালের মার্চ মাসের একেবারে শেষে—ত্রিশ বা উনত্রিশ তারিখে। আগের রাতে একটুও ঘুম হয়নি। পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকায় কী ঘটেছে, খুলনায় বসে তা জানার উপায় ছিল না—এমনই লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল পথঘাট, যোগাযোগের ব্যবস্থা। খবরের কাগজ আসা বন্ধ হয়েছিল।

রেডিও বোধহয় চলছিল, কিন্তু তা শুনে কিছু বোঝার উপায় ছিল না। দেশ অতি চমৎকার চলছে—এই কথাটা রেডিও থেকে বোঝা যেত বটে, তবে এ কথা বিশ্বাস করার লোক তখন বাংলাদেশে একজনও ছিল না। ঢাকায় ভয়ানক ঘটনা ঘটেছে সেটা জানতে কারও বাকি ছিল না। তবে, ঠিক কী ঘটেছে তার ধারণা করা নিজের নিজের আন্দাজের ওপরেই নির্ভর করছিল। খুব বাড়িয়ে আন্দাজ করার কল্পনাশক্তি যাদের ছিল তাদেরও আন্দাজ যে বহু গুণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল পঁচিশে মার্চের রাতের ঘটনা, সেটা আমরা জানতে পারি কয়েকদিন পরে। দিনের বেলা দূরের আগুন চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, শুধু একটা হুহু শব্দ ওঠে, আর ধোঁয়াটা কালো হলে খানিকটা দেখা যায় আকাশে পুরোপুরি মিলিয়ে যাওয়ার আগে। তবে প্রচণ্ড শব্দ ওঠে, বাতাস গরম আগুন হয়ে যায়, ঘরবাড়ি, সংসার-সামগ্রী পুড়ে যাওয়ার কটু গন্ধটাও বাতাস বয়ে আনে। রেল রাস্তার দু'পাশের টানা বস্তির কিংবা সড়কের ধারগুলোতে যৎকিঞ্চিৎ জনপদ পঁচিশে মার্চের পর থেকে অনবরত পুড়ছিল। সতর্ক, কণ্টকিত, স্নায়ু-পীড়নে জর্জরিত মানুষদের সঙ্গে যাতায়াতের পথে আমিও জনশূন্য কুঁড়েগুলো পুড়তে দেখতে পেতাম। এসব বসতির যারা বাশিন্দা তারা ততদিনে মুছে ফেলেছে নিজেদের, শূন্য ভিটেগুলোতে আধপোড়া বাঁশের খুঁটি মাটির উপরে কালো কালো জেগে আছে। টলটলে পানিতে ভাসছে গাদা গাদা ছাই। সন্ধের পর অত বড়ো শহর খুলনা দাউদাউ জ্বলা আগুনের ঘেরের মধ্যে পড়ে যেত। আগুনের একটা বিশাল বৃত্ত আকাশের নিচু ঝালর পোড়াতে পোড়াতে ঘেরটা ছোট করে আনছে। দিগন্ত ভয়াবহ আলোয় উজ্জ্বল, কিন্তু খানিকটা উপরে যেখানে আলো আর পৌঁছায় না, সেখানে কী ঝকঝকে শানানো অন্ধকার। সে অন্ধকার চিরে কান-ফাটানো আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ। যেন অন্ধকারই নিজেকে কঠিন আক্রোশে বিদীর্ণ করছে। আর এসব শব্দের সঙ্গে ঠিক ঠিক সঙ্গত হয়ে ভেসে আসত কুকুর-শেয়ালের চিৎকার। সেই শব্দ ভীতির না উল্লাসের বলা কঠিন। শেয়াল আর কুকুরেরা এই সময়েই সহাবস্থানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

দিনের বেলায় একরকম করে চলতো—গলার কাছে প্রাণটাকে কোনোরকমে ধরে রেখে, নিচু চোখে রাস্তার মেঝে দেখতে দেখতে, শক্ত মুখে মানুষজন চলাফেরা করতো—রাতে অন্ধকারে ডুবে-যাওয়া শহর সম্পূর্ণ নিস্পন্দ। উনত্রিশ তারিখে রাতে আমি ঘরে বসে বুঝতে পারি শহর

ছেড়ে যাওয়ার জন্য বাশিন্দারা তৈরি হচ্ছে। কতো দূরের শব্দ শুনতে পাচ্ছি—বাক্সপ্যাঁটরা টানাটানির নিচু ঘষ ঘষ শব্দ, বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদার মৃদু ধুপধাপ আওয়াজ কিংবা হঠাৎ কোনো শিশুর অতর্কিত চিৎকার, কান্না আর মাঝপথেই সেটা থেমে যাওয়া। কেউ তার মুখে হাত-চাপা দিয়েছে। বোঝা যায় অত্যন্ত সন্তর্পণে শহর ছাড়ার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে, যাতে কোনোমতেই কোনো শব্দ বাইরে না আসে। যেন মানুষেরা শব হয়ে চলাফেরা করছে, যেন মাথায়, পিঠে বোচকা-বুচকি নিয়ে হেঁটে, রিকশা ও অন্যান্য যানবাহনে শহরের সমস্ত মানুষ শবের মিছিল করে শহর ছেড়ে যাবে। প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ চলছে। কিন্তু নিশ্বাস রাখতে হচ্ছে বন্ধ করে। নিদ্রাহীন এত মানুষ এমন প্রচণ্ড তৎপর হয়ে উঠেছে অথচ শহর যেন মরে গেছে। একটু দূরের কোনো বাড়িতে হাত ফস্কে ধাতুর পাত্র পড়ে ঝনঝন আওয়াজ করে উঠল। সেটা থামতেই কানে আসে কষে বিছানা বাঁধার আঁক আঁক শ্বাস নেয়ার শব্দ। পাশের বিরাট বাড়ি থেকে আসছে একটা ঝপঝপ শব্দ। কেউ যেন কিছুক্ষণ পরে পরে ফ্রিজের দরজা খুলছে আর বন্ধ করছে। শব্দটা আমার মাথায় গেঁথে যায়, আমার তন্দ্রা আসে, তার ঘোরের মধ্যেই শুনতে পাই অস্পষ্ট ঝপঝপ শব্দ, কফিনের ডালা খোলা আর বন্ধ করার মতো। আমরা শহর ছেড়ে যাচ্ছি না। রাইফেলের গুলি ফাটার প্রচণ্ড কড়াং শব্দে ছেলে-মেয়েরা ঘুমের মধ্যেই বারবার আঁতকে উঠছে। একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে আছি তাদের দিকে, তারপর নিজের অজান্তেই ঘুমে ঢুলে পড়ছি।

সকালে নিদ্রাহীন চোখে বাসার বাইরে খোলা উঠোনটায় এসে দাঁড়াই। আতপ্ত দুই চোখ পুড়ছে, সকাল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে, শবেরা বেরিয়ে আসছে রাস্তায়। শত শত নীরব মানুষ, রাস্তা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, বোচকা-বুচকির মতোই ছেলেপুলে কোলে-কাঁধে উঠেছে। খানিকটা করে এগিয়ে দিয়ে কুকুরগুলো আবার ফিরে আসে শূন্য বাড়ির দিকে। বোঝাই রিকশা গাড়ি ট্রাকের ভিড়ে রাস্তার মোড়ে মারাত্মক যানজট। রাস্তার ভিড় থেকে চোখ ফিরিয়ে দেখতে পাই বাড়ির সামনের ন্যাড়া উঠোনটায় শুকিয়ে-ওঠা শিউলি গাছটার কঙ্কালে একটি দোয়েল শিস দিচ্ছে।

রাতে প্রচণ্ড গুলির আওয়াজ পাওয়া গেছে। সেসব গুলি শুধু কি বাতাসই চিরে শূন্যে মিলিয়ে গেছে—বিদীর্ণ করার জন্য পায় নি রক্তমাং-সমজ্জার লক্ষ্যবস্তু? তিন থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে এত বড়ো একটা নগর কী করে ফাঁকা হয়ে যেতে পারে, সে এক রহস্য। সবাই নদীর দিকে

গেছে—ওপারে বাগেরহাট, রামপাল, মংলা হয়ে মানুষরা ছড়িয়ে পড়বে বনজঙ্গল, খানাখন্দভরা খুলনা-বরিশালের ভেতরের গ্রামগুলোতে। পরিবার-পরিজনের হাত ধরে ভয়ঙ্কর বাদা, নাবি অঞ্চলে, শরণখোলা, পটুয়াখালী, ফরিদপুরের একেবারে ভেতরের দিকে চলে যাবে। তারপর অনাহারে, মড়কে-মারীতে হাজারে হাজারে মারা পড়বে, যদি না তার আগেই বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের বুলেট তাদের নাগাল পায়।

রোদ আর একটু চড়লে বাইরে বেরিয়ে এসে আমি শহরের শূন্য খোলের ভেতরে চৈত্রের বাতাসের দাপাদাপি শুনতে পাই। ঝরঝর করে শুকনো হলুদ পাতা ঝরে পড়ছে, বাতাস তাদের ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা জনশূন্য খাঁ-খাঁ। গরম হাওয়ার তোড়ে বালি-কাঁকর-ধুলো গায়ে ছুঁচ ফোটাচ্ছে। কেউ আমাকে কিছু বলে না, আমি ঠিক ঠিক সাউথ সেন্ট্রাল রোড আর হাজী মুহসীন রোডের মোড়ে এসে পৌঁছুই। পিচঢালা রাস্তার উপরে উকিলবাবুর তিন ছেলে শুয়ে আছে, সঙ্গে ধুতি-ফতুয়া গায়ে আর একজন মাঝবয়সী লোক। কী বিচিত্র শোয়ার ভঙ্গি তাদের? মাটিকে ভূমিবাহু ধরলে একজনের পা ত্রিভুজের মতো ভাঁজ করা, অন্য পা মেলে দেয়া। ছোট ছেলেটি, রাজপুত্রের মতো চেহারা, টকটকে ফর্সা রঙ, টিকোলো নাক, লাল গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট, হাঁটু ভাঁজ করে তলপেটের কাছে গুটিয়ে নিয়ে যেন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। মেজভাই দলামোচড়ানো, ডানবাহুর নিচে প্রায়-ছিন্ন মাথা, দুই চোখ চেয়ে রয়েছে, বাঁ হাতটি বড়ো ভাইয়ের গলার ওপর মেলে দেয়া। কী নিশ্চিন্তে আরামে শুয়ে থাকা, শুধু জীবিতরা এভাবে ঘুমোতে পারে না। আমি অনেকটা কাছে চলে যাই, যাওয়া উচিত নয় তবু যাই। রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে, ফেনা তুলে মৃদু কলকল শব্দে গড়িয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়, এখন শুকিয়ে চট্‌কা উঠে গেছে এখানে-সেখানে। কার কোথায় বুলেটের আঘাত দেখতে পাই না। রাজপথে এই চারজনের শুয়ে থাকা দেখতে দেখতে কেমন অদ্ভুত সম্মোহনের মধ্যে পড়ে যাই আমি। ওদের তিনজনকেই আমি চিনতাম। দোতলা বাড়িটা পাশেই, শেক্সপিয়র আর মিলটন পড়া উকিলবাবুর বাড়িতে আমি একসময় খুবই যেতাম। মাথা তুলে তাকিয়ে দেখি, দোতলার বারান্দায় উকিলবাবু আকাশের দিকে মুখ তুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। তার হালকা রুপোলি চুলগুলো এলোমেলো বাতাসে উড়ছে। আমি একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে থাকি এই ভেবে যে তিনি দৃষ্টি নামাবেন, হয়তো আবার, আবার দেখে নিতে

চাইবেন তাঁর তিন আত্মজের মুখ। কিন্তু আমার অপেক্ষা বৃথা হলো, আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন, তাঁর মৃত সন্তানরা শুয়ে রইল শেষ মার্চের তীব্র রোদে পিচ গলে-যাওয়া রাজপথে। রূপসা নদী বেশি দূরে নয়। ঘাটে এসে যখন দাঁড়াই তখন সূর্য একটু পশ্চিমে হেলেছে। রাস্তার দু'পাশের বড়ো বড়ো বাড়ির ছাদের দখল নিয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যরা। মেশিনগান বসিয়েছে সেখানে। ট্রিগারে আঙুল রেখে উবু হয়ে শুয়ে শ্বাপদের-হিংসুক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে ঘাটের হাজার হাজার নারী-পুরুষের ভিড়। কখন ট্রিগারে পড়বে আঙুলের চাপ কে জানে, তখন লুটিয়ে পড়বে শত শত মানুষ। এর মধ্যেই নৌকোর মাঝির সঙ্গে দরাদরি, বাক্স-তোরঙ্গ নিয়ে টানাটানি, শিশুর তীব্র চিৎকার, কোনো নারীর উতরোল কান্না। মৃত্যুর লোমশ উপস্থিতিও মানুষ বেশিক্ষণ মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না। আমি এই তৎপর জনতার ভেতর দিয়ে নদীর জলের সীমানায় গিয়ে দাঁড়াই। আকাশে এত রোদ, নির্মেঘ আকাশ কিন্তু এমনি জোরালো হাওয়া যে আসন্ন জোয়ারে ফেঁপে-ওঠা নদীর বুকে এখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউয়ের আলোড়ন। তার মধ্যে পরিবার-পরিজন নিয়ে গোখরোর চোয়াল থেকে বেরিয়ে যাওয়া ইঁদুরের মতো পলায়নপর যাত্রীদের নৌকোগুলো ঢেউয়ের ঢালুতে ঢালুতে মোচার খোলার মতো দুলছে। এরকম শান্ত আবহাওয়ায় নদীতে এত ঢেউ কখনো দেখি নি। ঠিক তখনি ঢেউয়ের ওঠানামার তালে তালে বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে যাওয়া লাশগুলো আমার চোখে পড়ে। অসংখ্য লাশ নেমে আসছে ভৈরবের স্রোত বেয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে। নাচতে নাচতে এলো তারা— সংখ্যাহীন, বৈশিষ্ট্যহীন একাকার লাশ। ঢেউয়ের মাথায় তারা আছে, ঢেউয়ের নিচে তারা আছে, ঢেউয়ের ঢালু বেয়ে গড়িয়ে তারা নামছে খেলা-প্রিয় জীবিতেরই মতো। পরস্পরে আটকে গিয়ে তারা জ্যামিতির নানা ছক বানাচ্ছে, আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা বর্ণনাহীন, তারা শুধুই লাশ, মানুষের লাশ। নাচতে নাচতে দৃপ্তভঙ্গিতে যাবে দক্ষিণে, তারা যাবে আরো দক্ষিণে, বৈঠা দিয়ে তাদের গিজগিজে হয়ে জমে থাকা স্তূপ সরিয়ে সরিয়ে পথ করে নিচ্ছে মাঝিরা, আবার এগিয়ে যাচ্ছে তারা দক্ষিণে, যাবে বলেশ্বরের স্রোতের মুখে হরিণঘাটার মোহনার দিকে। তার পরে বঙ্গোপসাগর।

সেই আমি প্রথম দেখলাম নারীর লাশ ভাসে উপুড় হয়ে, পুরুষের ভাসে চিৎ হয়ে।

১৯৭১ সালে সবচেয়ে

শস্তা দাম ছিল মানুষের রক্তের। একটু ভুল বলা হলো। মানুষের রক্তের কোনো দামই ছিল না। একেবারে বিনা দামে রক্তের স্রোত বইছিল। বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জ সেই রক্তস্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। খাল-বিল-নদী-নালা কানায় কানায় ভরে উঠেছিল।

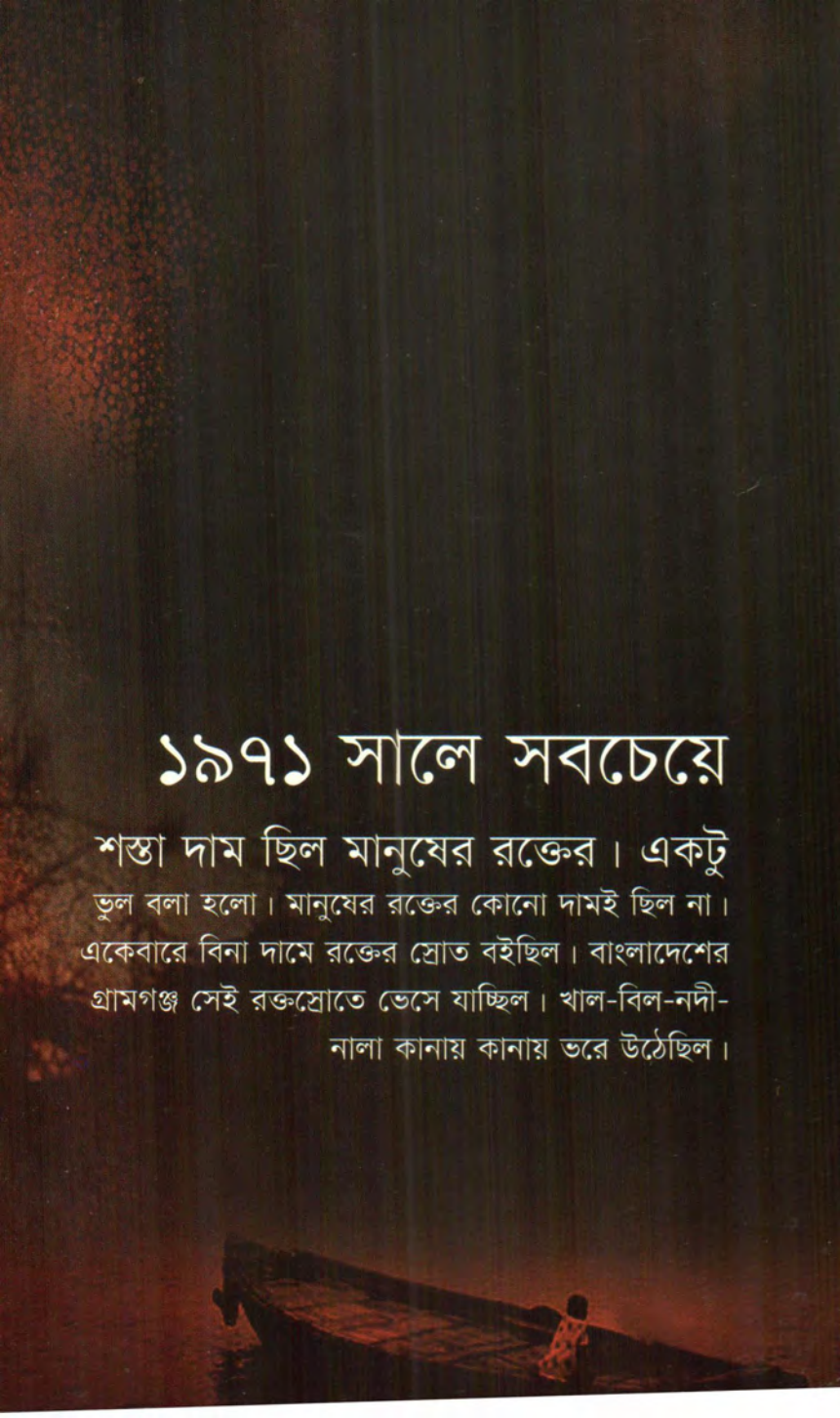

ঘরবাড়ি, খেত-খামার মাথায় মাথায় ডুবে যাচ্ছিল। সহজেই মনে হতে পারতো বাংলাদেশের আর কোনো জিনিশই রক্তের চেয়ে শস্তা ছিল না।

অন্যান্য জিনিসের দামও কিন্তু ভীষণ পড়ে গিয়েছিল। সে-ও বড়ো কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। দাম পড়ে গেল, না বলে বরং বলা যায় একাত্তর সালের মে-জুন নাগাদ টাকার দাম অসম্ভব বেড়ে গেল। সাধারণভাবে তিনগুণ। কখনও কখনও চার-পাঁচ গুণেরও বেশি। মার্চ মাসে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছিল দু'টাকা সের দরে। জুনে সেই মাংস নেমে এলো সেরপ্রতি আট আনায়। বাজারে মাছ পচতে শুরু করল। টাকায় এক সের গলদা চিংড়ি কেনার লোক পাওয়া যায় না। বেগুন, কুমড়ো, আলু, পটোল, শাক-সবজি কিনতে টাকার ভগ্নাংশ ব্যয় করারও দরকার পড়ে না। জিনিশপত্রের দাম কমে গেল না বলে বলতে হবে পাকিস্তানি টাকার দাম বেড়ে গেল।

টাকার দাম যে প্রক্রিয়ায় বাড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে জিনিশের দাম যেভাবে নেমে এলো তার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের রক্ত-ব্যাপারের কোনো সম্বন্ধ ছিল না। যে পাকিস্তানি বর্বরেরা এই রক্ত ঝরাচ্ছিল, রক্তের দাম সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। শহরের নিরাপদ ঘাঁটিগুলো থেকে গানবোটে কামান, বন্দুক সাজিয়ে তারা বাংলাদেশের নদী-নালা-খাল-বিল বেয়ে গ্রামে-গঞ্জে ঢুকতো আর মানুষের রক্তের বন্যা বইয়ে দিতো। গ্রাম ঘেরাও করে তারা নিরস্ত্র মানুষকে তাড়িয়ে এক জায়গায় এনে জমা করতো, তারপর তাদের হত্যা করতো। হাট ঘিরে ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ মারতো। বাধা না পেলে, মানুষের হাতে অস্ত্র না থাকলে বড়ো নির্ভয়ে অশেষ বীরত্বের সঙ্গে মানুষ মারায় পাকিস্তানি সৈন্যদের জুড়ি ছিল না। এইভাবে যে রক্ত বইতে শুরু করেছিল তা আর শুকনোর কোনো উপায় ছিল না। মানুষ মেরে গ্রামগুলোকে খালি করে সেসব জনহীন শূন্য গ্রামে যে আগুন লাগিয়ে দেয়া হতো, দিনে-রাতে সে আগুন নেভাবার আর কোনো উপায় ছিল না। বাংলাদেশের রাতের আকাশ জোড়া সে আগুনের শিখা লকলক করে কালো আকাশ চেটে বেড়াতো, দিনের বেলা সেই শিখা কড়া রোদের আলোয় আত্মগোপন করে শুধুই ফোঁস ফোঁস করে ফুঁসতো। আর ঝড়ো হাওয়া ডেকে আনতো।

এভাবে সমস্ত কিছু থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। মানুষের দেহ থেকে রক্ত, রক্ত চলাচলের জংশন হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত, আগুন আর ধূম থেকে

রক্ত, হাওয়া থেকে রক্ত। বিন্দু বিন্দু ছিল্‌ছিলে রক্ত জমির নাড়ায় নাড়ায়, খেত-খামারের কাঁকরে, বালিতে, বিনবিনে ঘামের মতো ঘরদোর-উঠোনে রক্ত। বাংলাদেশের রোমকূপে রোমকূপে রক্ত। তারপর বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ড যখন ধক্‌ধক্‌ শব্দে জোরে চলতে শুরু করলো তখন এই রক্তে নদী-নালা-খাল-বিল ভরে উঠলো।

মনে হতে পারতো পাকিস্তানিরা একেবারে বিনা দামে এই রক্ত খুঁড়ে তুলছিল। কারণ কোনো কিছুর জন্যই দাম দেয়া পাকিস্তানিদের ধাতে ছিল না। রক্তের মতোই তারা শস্তা করে তুলেছিল নারীমাংস। রক্তমাখা নারী-মাংস স্তূপাকার করে তাতে গড়াগড়ি দিচ্ছিল তারা। এর জন্য তারা কোনো দাম দিতে চায় নি। তাদের ধারণা ছিল, ওসবের জন্য কোনো দাম দেয়ার দরকার নেই। মানুষের প্রাণ যখন শস্তা হতে হতে একেবারে দামহীন হলো, তখন অন্যান্য পণ্যের দামও হুড় হুড় করে নিচে নামতে শুরু করলো। খেতে-খামারে মানুষ নেই, কিন্তু ফসল তো আছে। গ্রামে-গঞ্জে মানুষ নেই, ঘরদোর খাঁখাঁ করছে, বড়ো বড়ো ভেড়ার পালের মতো মানুষের দঙ্গল উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, পঙ্গপালের মতো দেশ ছাড়ছে—কিন্তু মাঠে-ঘাটে ফসল ছড়ানো, গোলায় খাদ্য মজুদ, জনহীন হাটেবাজারে ফেলা-ছড়া সামগ্রী, ক্রেতা নেই, মালিক নেই। সে সব পড়ে পাওয়া মাল যখন শহরের বাজারে আসতে থাকলো তখন দাম দিয়ে কিনবে কে, বাজারে যারা নিয়ে এসেছে তারা কোনো দাম দেয় নি। মালিকহীন খেত থেকে তুলে এনেছে আলু, বেগুন, মুলো, কুমড়ো, পেঁপে, শবজি, গোলা ভেঙে নিয়ে এসেছে বস্তা বস্তা ধান, বাড়ি লুট করে এনেছে চাল-ডাল। কোথাও তো দাম দিতে হয় নি। যে গরুটি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে গলার ছেঁড়া দড়ি নিয়ে কিংবা খুকির যে কালো গাইটি এখনও বাঁধা আছে গোয়ালে, সেটাকে তো যে কেউ দড়াম করে মাটিতে ফেলে গলায় ছুরি চালিয়ে দিতে পারে। বাধা কোথায়? কসাই হারালো তাদের ব্যবসা, কারণ কসাইয়ের কাজটা অনেকেই হাতে তুলে নিলো। অনেক কসাই উন্নত ধরনের ব্যবসা ধরলো পরীক্ষামূলকভাবে। পাকিস্তানি বাহিনীর যেসব ঢাউস কালো ভ্যানগুলো দিনের বেলা শহর ছেড়ে গ্রাম-গঞ্জে চলে যেত আর সন্ধের ফিকে অন্ধকারের মধ্যে চোরের মতো নিঃশব্দে ফিরে আসতো তেরপলঢাকা দিয়ে, সেসব গাড়ি তো ফাঁকা ফিরতো না। সেগুলোতে ঠাসা থাকতো কালো কালো মানুষের দল, ক্ষুধার্ত, ভীত, নিরস্ত্র লেংটিপরা মানুষ। শহরতলির রাস্তা ধরে

বিষণ্ন, ঘাড় ঝুঁকিয়ে থাকা সন্ধ্যায় এসব কালো গাড়ির অন্তহীন স্রোত, ভেতরে নিঃশব্দ আতঙ্কে হিম মানুষ। গায়ে গায়ে লাগালাগি যেন পায়ে-মাথায়-কনুইয়ে-ঘাড়ে গাঁথা জমাট মনুষ্যপিণ্ড। এদের চালান আসছে গাঁ থেকে, গঞ্জ থেকে, বাংলাদেশের মাঠপ্রান্তর থেকে। মাঝরাতে আবার এসব ভরা গাড়ি শহরের রাস্তা কাঁপিয়ে প্রথম গিয়ারে ঘড়ঘড় আওয়াজে শহরের বাইরে বধ্যভূমিতে যাচ্ছে। কসাইদের অনেকে গরু-ছাগলের গোশত্ বিক্রির ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এসব বধ্যভূমিতে নতুন কাজ নিল। কসাইরা বলেছে, মানুষের গলায় আছে এক রকমের হালকা সূক্ষ্ম ঝর্ঝরে বালি, ছুরি গলায় বসালে আপনাআপনিই তার ধার বেড়ে যায়, পরে আর শান দেয়ার দরকার পড়ে না।

আমি যতোবার চেষ্টা করছি আলু, পটোল, মাছ, মাংস, শাক-শবজির প্রসঙ্গটাকে ধরে রাখতে, বারবার রক্তের প্রসঙ্গ এসে হাজির হচ্ছে। কারণ এইটার চালানই ছিল সবচেয়ে বেশি, এতো বেশি যে এখানে পাকিস্তানি টাকা তেমন কোনো সুবিধা পায়নি। যেসব সামগ্রীর জন্য কোথাও কোনো দাম দিতে হয় নি, বাজারে আসার পর সেসব জিনিশের ওপরেই টাকার জোর খামচে ধরলো।

একটা টাকা বের করলেই বড়ো একটি রুই মাছ সংগ্রহ হয়ে যাচ্ছিল। একটা আধুলি ফেললেই খুকির কালো গাইটির সিনার নরম চর্বিভরা পাকা এক সের গোশত্ থলেয় ঢুকে পড়ছিল। যখন সরকার উঠে গেল, প্রশাসন ঢিলে হয়ে পড়লো, মানুষের বাড়ি-ঘর-দোরে লাগলো আগুন, আকাশে আকাশে খেলা করে বেড়াতে লাগলো, যখন কসাইদের ছুরি আর সৈন্যদের বন্দুক রক্তের নেশায় মাতাল হয়ে উঠলো, ঠিক তখুনি পাকিস্তানি টাকার প্রভাব প্রকট হলো।

কিন্তু দাম জমছিল কোথাও। সে জায়গাটা চোখে দেখা যাচ্ছিল না বটে কিন্তু জমা হচ্ছিল ঠিকই। যে জিনিশটা একেবারে বিনা দামে শুধু শুধু বয়ে যাচ্ছিল বলে মনে হয়, দামের হিশাবটা সেখানেই জমা ছিল। রক্তের হিশাবটার আর কোনোভাবেই ফয়সালা হয় না। রক্ত বাদ দিয়ে টাকার এখানে কোনো ভূমিকা নেই। একাত্তর সালের মধ্যেই সবচেয়ে আক্রা জিনিশটার দাম পাকিস্তানিদের বড়ো কষ্ট করে শোধ দিতে শুরু করতে হলো। টাকা এখানে কোনো কাজে এলো না। কারণ রক্ত শস্তা তো নয়ই, রক্তের কোনো বিনিময় মূল্য নেই। রক্ত একমাত্র রক্ত দিয়েই শুধতে হয়। রক্তের স্থলে রক্তের বিনিময় চলতে পারে।

খালেদ রশীদের সঙ্গে শেষ যেদিন দেখা হয় সেদিনের কথা দিয়েই এই লেখাটা শুরু করি। একাত্তরের এপ্রিলের শেষ দিকে, সঠিক তারিখটা মনে নেই—বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটায় তিনি আমাদের খুলনার মুসলমান পাড়ার বাসায় এলেন। তাঁকে চেনার কোনো উপায় নেই। পরনে একটা গাঢ় সবুজ রঙের লুঙ্গি, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত তোলা, গায়ে একটা রঙ জ্বলে যাওয়া গামছা। বরাবর তিনি পরতেন শাদা পাজামা, খদ্দরের পাঞ্জাবি, হাতা দুটি শুধু এক ভাঁজ গুটানো। নিজের জীবনের প্রায় সবকিছুকেই তুচ্ছ করেছিলেন, পুরোপুরি মুক্তপুরুষ যাকে বলে। শুধু একটি ব্যাপারেই সামান্য পছন্দ কাজ করতো। তিনি ধোপদুরস্ত পোশাকে থাকতেন। তাঁকে ময়লা পাজামা-পাঞ্জাবিতে দেখি নি বলা চলে। যে পোশাকে আজ তিনি আমাদের বাসায় এলেন তাতে পাঁচ হাত দূর থেকেও হয়তো তাঁকে আমি চিনতে পারতাম না, যদি না তাঁর হাঁটায় একটা ত্রুটি থাকতো। তাঁর একটি পা অন্য পা-টির চেয়ে একটু খাটো আর অপুষ্ট ছিল। সে জন্য সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটতে হতো তাঁকে। সেই হাঁটাটা দেখে অনেকটা দূর থেকে ওঁকে আমি চিনতে পারলাম।

মাত্র একটা দিন না দেখার পরে হলেও খালেদ রশীদকে দেখতে পেলে আমার যে ঠিক কেমন লাগতো তা আমি কোনোদিনই কাউকে বোঝাতে পারব না। একাত্তরের জানুয়ারির শুরু থেকেই তিনি আমাদের ত্যাগ করেছিলেন। ছিলেন খুলনা গার্লস কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। আমি ঐ কলেজে যোগ দিয়েছিলাম খালেদ রশীদের অল্প কিছুদিন আগে। চাকরিতে যোগ দেয়ার দিন আমাকে দেখে আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে এমন করে হাসলেন যেন গত দশ বছর আমরা এক বাড়িতে আছি আর এক থালায় ভাত খাচ্ছি। অথচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আটান্ন ঊনষাট সালে ওঁকে একটু-আধটু চিনতাম বটে, কিন্তু তাকে ঘনিষ্ঠতা বলা চলে না। আধো-অন্ধকার ঘরে সারাদিন তাস খেলতেন, গলার আওয়াজটি সরু আর

তীক্ষ্ণ, মুখ খারাপ নয়, কিন্তু তিনি বিদ্যুৎভাষী, প্রতিটি কথা মোক্ষম। সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাজশাহী সরকারি কলেজের সামনে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান আর চুন মুখে ভরে একমুঠো কালো জর্দা হাঁ করে গলায় ঢেলে দিতেন। অতটা জর্দা একসাথে খেলে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা। খালেদ রশীদকে সেই সময়টায় ভারি রুক্ষ স্বভাবের মানুষ বলে মনে হতো আমার। মাথায় খুব মিহি অল্প চুল, তেল দিতেন না—পরে শুনেছি বিশ বছর তেল দেন নি মাথায়—চুলের রঙ কটা হয়ে গিয়েছিল। বিরাট কপাল, চৌকো চোয়াল, কটা চুল আর পান-জর্দা খাওয়া কুচকুচে কালো দাঁত সব মিলিয়ে তাঁকে খুব বদমেজাজি দেখাতো। ইচ্ছে করেই ছাত্রজীবনে কোনোদিন ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করি নি তাঁর সঙ্গে। আচ্ছা, কেন লক্ষ্য করি নি খালেদ রশীদের মতো এমন সুশ্রী মানুষ বাঙালিদের মধ্যে দেখাই যায় না সাধারণত। প্রশস্ত কপাল কি অসম্ভব শান্ত। সেই কপাল আবার সুডৌলভাবে উঁচু, সক্রেটিস বা লেনিনের কপালের মতো। বিশাল গভীর দুটি চোখ, বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। আর ঐ চৌকো চোয়াল যেন পাথর কুঁদে তৈরি; দৃঢ় সঙ্কল্পে আর অসাধারণ নৈতিক স্থিতিতে স্থিরনিবদ্ধ কালোর ধার ঘেঁষা শ্যামলা রঙ ছিল তাঁর।

খুলনা গার্লস কলেজে যোগ দেয়ার পর অল্প কিছুদিন তিনি দৌলতপুর থেকে খুলনা যাতায়াত করতেন। আমি থাকতাম আর একটু দূরে—ফুলতলায়। একসঙ্গেই যশোরের বাসে বাড়ি ফিরতাম আমরা, উনি দৌলতপুরে নেমে যেতেন। খালেদ রশীদের বাবা তখন দৌলতপুরে পাটের ব্যবসা করতেন। এটা একটু আশ্চর্য ব্যাপারই বটে। ভদ্রলোক ছিলেন আজীবন শিক্ষক। বিদেশে গিয়ে কোনো একটা ডিগ্রিও করে এসেছিলেন। স্কুল ইন্সপেক্টর হিশেবে বোধহয় অবসর নেন। তিনি যে কেন এই বয়সে ব্যবসায় নেমেছিলেন তার একটা চমৎকার মনে-ধরা কারণ আবিষ্কার করেছিলেন খালেদ রশীদ। বলেছিলেন, ওঁর কিছু টাকা আছে, সেটা পুরোপুরি খোয়ানোর জন্যই এই ব্যবসা। কথাটা হাসির বটে, কিন্তু বাবাকে চিনতেন বলে খালেদ রশীদ কথাটা ঠিকই বলেছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সর্বস্বান্ত হয়ে তিনি দেশে ফিরে গেলেন। খালেদ রশীদ পুরোপুরি খুলনার বাশিন্দা বনলেন। বাশিন্দা কথাটা লিখলাম বটে, তবে বাস করার জন্য তাঁর কোনো কিছুর প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। সাধারণত কোনো বন্ধুর সঙ্গে যেমন-

তেমন একটা ঘরে ভাগাভাগি করে থাকতেন। সকালে বেরিয়ে আসতেন, ঘরে ফিরতেন রাত বারোটার পর। এর আর হেরফের নেই। ঢাকা দেয়া দুপুরের খাবার রাতে খেতেন। খাদ্য-অখাদ্য ঠাণ্ডা-গরম কোনো পরোয়া নেই। খাওয়াটা ওঁর ভাষায় ছিল গর্ত বুজনো। কথাটা তিনি আক্ষরিক অর্থেই বলতেন। খুব ভালো খাবারের প্রশংসা কোনোদিন শুনি নি তাঁর মুখে। বাসি-পচা খাবার খেয়ে নাক সিটকোতেও দেখি নি। তবে তাঁর বন্ধুদের স্ত্রীদের হাতের রান্নার অসম্ভব প্রশংসা করতেন। আমার ধারণা, মেয়েদের প্রতি তাঁর অন্তহীন মমতা এবং সহজাত একটা সম্মান ও কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই এমন করতেন। খালেদ রশীদকে শেষ পর্যন্ত রুক্ষ মেজাজের মানুষই বলতে হবে। কিন্তু মেয়েদের প্রতি এমন স্বাভাবিক বিনয়, এমন আন্তরিক সৌজন্য আর এমন মমতাভরা পক্ষপাত আমি কম মানুষের মধ্যেই দেখেছি। তবু জীবনে কিছুই চাইলেন না তিনি, একেবারে কিছুই না। স্ত্রী নয়, সন্তান সংসার গৃহ বিত্ত কোনো কিছু এতটুকু টানলো না তাঁকে। অথচ মানুষটি পুরোপুরি সামাজিক। দেশ আর মানুষ ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। গার্লস্ কলেজে চাকরি নেয়ার অল্প কিছুদিন পরেই অবস্থাটা দাঁড়ালো এই যে, আমাদের যেখানে প্রত্যেকের নিজের নিজের পরিবার চালানো আর সামলানোর দায়িত্ব থাকে, রোজগার করতে হবে, নিজের ভাগটা বুঝে নিতে হবে, শুঁকে শুঁকে যেখানে অর্থ আর স্বার্থ আছে বুঝতে পারা যাবে, একেবারে ইঁদুর ছুঁচোর মতো সেখানে গিয়ে জুটতে হবে—এই সমস্ত কিছু থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেলেন অথচ পরিচিত সকলের সংসারই তাঁর নিজের সংসার হয়ে উঠলো। কেউ মারাত্মক অসুস্থ, অবিলম্বে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা দরকার, কারো বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে আসতে হবে, নিয়ে আসতে হবে, কোনো বন্ধুপত্নী অক্ষরজ্ঞান থেকে শুরু করে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবেন—কার কোন্ কাজটা যে তিনি করে দিতেন না তাই অবাক হয়ে ভাবি। আমাদের প্রথম সন্তান ফুলতলার গ্রামে একজন ধাত্রীর সামান্য একটু সাহায্যের অভাবে মারা গিয়েছিল। এজন্য আমাকে তিনি জীবনে ক্ষমা করেন নি। দ্বিতীয় সন্তানটি জন্মের সময় এলে খুলনায় নিজের ঘরটি আমার স্ত্রীর জন্য ছেড়ে দিলেন। অন্তত মাস দুয়েকের ব্যাপার, আপনার অসুবিধে হবে তো—এ কথা তাঁকে বলতে গেলে প্রচণ্ড ধমক দিয়েছিলেন আমাকে। আমি খুলনায় বাস শুরু করার

পর অর্থের অভাবে পাখার ব্যবস্থা না করতে পারায় শিশুকন্যা নিয়ে আমার স্ত্রী গরমে অসম্ভব কষ্ট পাচ্ছিলেন। একদিন বিকেলে বাসায় ফিরে দেখি নিজের ঘরের ফ্যানটি খুলে এনে আমাদের ঘরের মাঝখানে টেবিল টেনে ঘর্মাক্ত কলেবরে সেটা লাগাচ্ছেন। ফ্যানটি বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে শুরু করেছে, আমার চোখ ভিজে ওঠার উপক্রম, কিন্তু ভয়ে একটি কথা বলতে পারছি না। আমার স্ত্রী কিন্তু বেশ কড়া গলাতেই বললেন, এটা কীরকম কথা হলো, নিজের ঘরের ফ্যান... তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই খালেদ রশীদ তাঁর সেই অবিস্মরণীয় শিশুর হাসি হেসে বললেন, আমার গরম লাগে না। আমি তো ফ্যান চালাই-ই না। নিজের যা কিছু আছে সর্বস্ব দিয়ে দিতেন আর ক্রমাগত মিথ্যে কথা বলতেন, আমার লাগে না, আরে দূর, আমি তো ব্যবহারই করি না। এই লেখাটা পড়তে পড়তে অনেকের মনে হবে তিনি বোধহয় আমারই প্রতি বিশেষ দুর্বল ছিলেন। মোটেই তা নয় কিন্তু। আমি বরং চাকরি-বাকরি করে একরকম ভালোই ছিলাম। আমি যে দুটি ঘটনার উল্লেখ করলাম তেমন শত শত কাজ তিনি সকলের জন্যই করতেন। এ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই চটে উঠতেন। একমাত্র মেয়েদের কাছেই তাঁকে কখনো মেজাজ খারাপ করতে দেখি নি। কাঁচুমাচু করতেন আর সেই অপার্থিব হাসিটি দিয়ে সব উড়িয়ে দিতে চাইতেন। এই জন্যই বলছিলাম আমাদের প্রত্যেকের একটা একটা সংসার, খালেদ রশীদের হাজারটা সংসার। আর তাঁর ভালোবাসা ছিল শিশুদের প্রতি। যে কোনো বাসায় গেলে বাচ্চারা যে কী করতো তাঁকে নিয়ে! কেউ দাবা খেলতে চাইছে—কেউ পিঠে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে ঘোড়ায় চড়বে, কেউ ছবি আঁকবে, কেউ অঙ্ক দেখিয়ে নেবে। কখনোই তাঁকে বিরক্ত হতে দেখি নি।

থাক, খালেদ রশীদের ভালোবাসা আর মমতার কথা বলে কী হবে? দয়া আর মমতায় তো সমাজ বদলায় না। তাতে আর কী লাভ? না, লাভ কিছুই নেই, শুধু ভোলা যায় না জীবনে, এই আর কি? বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধুরা খালেদ রশীদকে ডাকতেন 'গুরু' বলে। নেহাতই ঠাট্টা ছিল বোধহয়। কিন্তু আসলে এটা ছিল একটা মর্মান্তিক সত্যি কথা। কারণ তিনি চলে যাওয়ার পরে এইভাবে ডাকার আর কোনো লোক এ পর্যন্ত মেলে নি। আমিও এই ডাকটা চালু করে দিলাম। তারপর কিছুদিনের মধ্যে দেখি সারা শহরে সবাই তাঁকে ডাকছে 'গুরু' বলে। অনেক কাল

পরে একদিন শুনি আমার বাবা বলছেন, আজ বিকেলে কি গুরু আসবে? ওকে একটা কথা বলার আছে।

সকলের প্রীতি ভালোবাসা আর মমতাটা খালেদ রশীদ ধীরে ধীরে সংগ্রহ করে নিতে থাকলেন। প্রথম এলেন একটি সংগঠনে। সন্দীপনে। নাজিম মাহমুদ, মুস্তাফিজুর রহমান, জহর রায় ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। সাধন সরকার তো আছেনই। তার পরে পরে জুটলাম আমি, বিদ্যুৎ সরকার, প্রধীশ রঞ্জন বিশ্বাস, বাগেরহাট থেকে আবুবকর সিদ্দিক, আমার বড়ো বোন জাহানারা বেগম আর একঝাঁক তরুণ, আবু, মনোয়ার, আইনুল, নেওয়াজ, জাহিদ—অতো নাম কি মনে থাকে? সংগঠনের সভাপতি প্রাক্তন স্পিকার আবদুল হাকিম। খালেদ রশীদ আসেন, চুপচাপ বসে থাকেন, চলে যান। একেবারে কেউ-ই খেয়াল করতে পারলাম না দু-এক মাসের মধ্যে খালেদ রশীদ সন্দীপনের সাংগঠনিক দিকটার প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। তাঁর নেতৃত্বটা এমনিই স্বাভাবিক ধরনের ছিল যে কোনোরকম হৈচৈ, আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই তিনি হয়ে উঠতেন মুখ্য নিয়ন্ত্রক। সন্দীপনে ঠিক তাই ঘটলো।

এদিকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসন চণ্ডরূপে দেখা দিতে লাগলো। মানুষের মনে ক্ষোভ-অসন্তোষও বাড়তে লাগলো আনুপাতিক হারে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিভক্তিটা এইবার তীব্র চেহারায় প্রকাশ পেতে শুরু করলো দেশের ভেতরে পার্টির মধ্যে। আমি নিজে কখনো ভাবি নি, খালেদ রশীদ খুব বেশি একটা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবেন। ছাত্র অবস্থায় ছাত্রলীগে কাজ করতেন এইমাত্র জানতাম। কিন্তু দেখা গেল সন্দীপন সংগঠনের ভেতর দিয়ে তিনি ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক সংযোগগুলো আস্তে আস্তে—দেশের রাজনীতি আর সেই সময়ের আন্দোলনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েই যেন—ছেঁটে ফেলতে শুরু করলেন। ভাবতে শুরু করলেন গোটা দেশের মানুষের মুক্তির কথাটা আর একেবারে একা, পুরোপুরি নিজে নিজে বজ্রের মতো একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে তাঁর এই ভাবনায় তাঁর নিজের জীবনের সাধ্যমতো সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করবেন। কবে কখন তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জানি না। এটা জানার সম্ভাবনা আমারই ছিল। একটি গোপন কমিউনিস্ট পার্টির দলিলপত্র পূর্ব সংযোগসূত্রে আমার কাছে আসতো। সঙ্গী পাওয়ার জন্যই সেসব আমি খালেদ রশীদকে দেখাতাম। দু'একটি ছোটখাটো পাঠ-সভায় তাঁকে টেনেও

নিয়ে গেছি। দেশের রাজনীতি আর আন্দোলন যতো তুঙ্গে উঠতে লাগলো সাংস্কৃতিক সংগঠন হিশেবে সন্দীপনের রাজনৈতিক রূপটাও ততোই উগ্র হয়ে উঠতে শুরু করলো। সংগঠনের তরুণ কর্মীরা সব খালেদ রশীদের অনুগামী। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি গেল বদলে। নাজিম মাহমুদের একুশের গানগুলোতে সাধন সরকার যে প্রত্যয়দৃঢ় স্মৃতি-জাগানিয়া সুর দিয়েছিলেন, ষাটের দশকের শেষ দিকে লেখা সেই নাজিম মাহমুদেরই গণসঙ্গীতগুলোয় সাধন সরকার আগুন-ভরা সুর চাপালেন। আবুবকর সিদ্দিকের 'ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল'-এর যে সুর তিনি দিয়েছিলেন তা শুনলে যেন প্রতিবাদ আর বিদ্রোহের তপ্ত প্রবাহ শিরায় শিরায় ছুটে বেড়াত। আমরা তো সবাই জানি এই গান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রায় প্রতিদিন বাজানো হতো।

সাতষট্টি কিংবা আটষট্টি সালে খুলনা গার্লস কলেজ সরকারি কলেজ হচ্ছে—এই ঘোষণা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খালেদ রশীদ চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। অধ্যাপকরা চাকরির স্থিতি পেয়ে প্রায় উৎসব শুরু করে দিয়েছেন। খালেদ রশীদের চাকরি ছেড়ে দেয়ার কথা শুনে তাঁরা অবাক তো বটেই! সকলেই জিগ্যেস করতে লাগলো, এটা আপনি কী করলেন? খালেদ রশীদের মুখের চেহারা ততোদিনে কঠিন হয়ে এসেছে। কথা বরাবর কমই বলতেন, এখন যেন একটি বাক্যও খরচ করতে নারাজ তিনি। প্রায়-তেতো হাসির সঙ্গে শুধু একটা কথাই বলেন, সরকারি চাকরি করব না। এতো লোকে করছে আপনার অসুবিধাটা কোথায়? এই প্রশ্নের আর কোনো জবাব তিনি দিতেন না। একটু আগেই বলছিলাম, মুখের চেহারা কঠিন হয়ে এসেছে, সমস্ত শরীর যেন ধুলোমাখা, খদ্দরের পাজামা-পাঞ্জাবি তখনো পরছেন কিন্তু সে সব এতো ময়লা, দলা-মোচড়ানো বলার নয়। কেউ কোনো অনুরোধ করলে কিংবা কোথাও নিমন্ত্রণ করলে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতেন। তাঁর কর্মক্ষেত্রের সঙ্কুলান আর সন্দীপনে হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। সন্দীপনের অনেক ছেলে খালেদ রশীদের সঙ্গে অন্য কাজ করছিল। পিকিং রিভিউ, মাও-সে-তুংয়ের লাল বই শহরের গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সারাদেশের আবহাওয়ায় আগুন। স্কুল-কলেজ থেকে দলে দলে ছেলেরা বেরিয়ে আসছে আর সেখানে ফিরে যাবে না। দেখতে দেখতে বন্যার তোড়ের মতো নকশালবাড়ি আন্দোলন আছড়ে পড়লো দেশে। খালেদ রশীদকে

আর প্রায় দেখতেই পাই না। দেখা হলেও তাঁর সঙ্গে বলার মতো কথা খুঁজে পাই না। শুধু বলি, আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পারি না—অন্য কোনো কারণে নয়, এই পথ জনবিচ্ছিন্নতার পথ। তিনি বলেন, ঠিক উল্টো, মাছের জন্য পানি যেমন, দেশ জনগণ আমাদের জন্য ঠিক তাই, আমরা সেখানে মিশে যাব, জনগণের শত্রু আর দুশমনদের আঘাত করবো ভেতর থেকে।

সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণিটিকে খালেদ রশীদ পরিত্যাগ করলেন। থাকতেন একটা অন্ধকার ছোটো ঘরে, দিনের আলোতেও সে ঘরের ভেতরটা আবছা। দিনের পর দিন বেরোতেন না ঘর থেকে। দুঃসহ তপস্যা শুরু করলেন তিনি। আমি নিজে দেখেছি টানা আঠারো ঘণ্টা তিনি পড়ছেন—মার্ক্স্, অ্যাঙ্গেলস, লেনিন, মাও-সে-তুং, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞানের গাদা গাদা বই। তখন কথা বললেই বুঝতে পারি, এই খিদেটাই শুধু রাক্ষুসে নয়, এক অসাধারণ মেধাবলে জমিয়ে রাখছেন, বিশ্লেষণ করছেন, সংশ্লেষণ করছেন যা কিছু পড়ছেন তার সবই। সক্রেটিস বা লেনিনের সেই উঁচু কপালে এখন প্রশান্তি নেই। সেখানে খুব দ্রুত ফুটে উঠছে বলিরেখা, বিশাল চোখ দুটি এখন নিদ্রাহীন আরক্ত। সারা বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের ওপর অকথ্য নিষ্পেষণ ও দারুণ শোষণ যেন এক ঘনীভূত কঠিন পিণ্ডের আকারে তাঁর গলায় আটকে গেছে। আর সময় নেই, আর মধ্যবিত্তের ভদ্রতা, সৌজন্য, প্যাচপেচে ভালোবাসার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই তাঁর।

আইয়ুব খান বিদায় নিলো, ইয়াহিয়া এলো, নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হলো, খালেদ রশীদ নির্বিকার। গার্লস্ কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সুন্দরবন কলেজ নামে আর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেখানে পদার্থবিজ্ঞান পড়াতেন।

একদিন সলিম হোটেলের বারান্দায় আমরা ক'জন বসে আছি। খালেদ রশীদও ঘটনাচক্রে ছিলেন সেখানে। খবর পাওয়া গেল একজন পুলিশ অফিসার তার বাহিনী নিয়ে অভিযানে আসছেন সলিম হোটেলে। ম্যানেজার পাঁড় রক্ষণশীল ইসলামপন্থি—ভীষণ মুখ খারাপ, তবে ধপধপে পরিষ্কার মনের ভালোমানুষ। খালেদ রশীদের কোনো কিছুই মেনে নেয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বারান্দায় এসে খালেদ রশীদের বাঁ হাতটা ধরে তাঁকে টানতে টানতে দোতলায় নিজের শোবার ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দিলেন।

ধড়াচূড়া পরে হাজির হলেন পুলিশ অফিসারটি। সঙ্গে একগাদা পুলিশ। আমি তাঁকে বিলক্ষণ চিনতাম—তিনি বেঁচেও আছেন; কিন্তু তাঁর নাম আমি করব না। বেচারা তো চাকরিই করতেন। দাপটের সঙ্গে বারান্দায় উঠে আমাদের জিগ্যেস করলেন, খালেদ রশীদ কই? আমরা তো জানি না তিনি কোথায়। আমরা খবর পেয়েছি, এই একটু আগেই তিনি এখানে আপনাদের সঙ্গে বসেছিলেন। কোথায় গেলেন তিনি? বেরিয়ে এলেন বহুদর্শী ম্যানেজার, তিনি যে এই বারান্দায় নেই তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? এখন ভেতরে আসুন—আর আর ঘর বাথরুম-ফাথরুম দেখুন, থাকলে নিয়ে যান। অত কথায় কাজ কি? তন্নতন্ন করে দেখা হলো। শেষে ম্যানেজারের শোবার ঘরে এসে—এই ঘরটা? ম্যানেজার বললেন, এটায় আমি থাকি, এটাও খুলতে হবে নাকি? দুমদাম করে পুলিশ সব চলে গেল। দরজা খুলতে দেখা গেল খালেদ রশীদ ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছেন। ম্যানেজার তাঁর বিচিত্র ইংরেজি ভাষায় বললেন, কাওয়ার্ডিং জেন্টেলম্যান, আনপিউরিফাইং মাই রুম, গেট আপ, শাট আপ, গো। খালেদ রশীদ বললেন, দুধ-চিনি ছাড়া এক কাপ চা পাঠিয়ে দিন তো!

সত্তরের শেষে বা একাত্তরের একেবারে গোড়ায় খালেদ রশীদ সুন্দরবন কলেজের চাকরিটাও ছেড়ে দিলেন। খুলনাই ছেড়ে দিলেন। তাঁর নিজের শ্রেণি—যার মধ্যে তাঁর বাপ মা ভাই বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন, পরম প্রিয়ভাজন মানুষরা ছিল সেই শ্রেণিটিকে ছেড়ে দিলেন। পোশাকটাও বদলালেন। সবুজ লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে আর গামছা জড়িয়ে তিনি দেশের একেবারে হৃৎপিণ্ডের কাছে চলে গেলেন। যিনি গেলেন তাঁকে কিন্তু আমি সত্যিই চিনি না। একদিন শীতকালে ঝকঝকে আবহাওয়ায়, কিছু খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে পরিবারের সবাই মিলে দুপুরটা নৌকোয় ঘুরে বেড়াব ঠিক করেছি। বেরোনোর মুখে এলেন খালেদ রশীদ। ছেলেমেয়েসহ আমরা সবাই বলেছিলাম, গুরু, চলুন আমাদের সঙ্গে। তখনো তিনি চাকরি ছাড়েন নি। এইরকম সকলের অনুরোধে কখনো তাঁকে না বলতে শুনি নি। মুখটা কঠিন করে তিনি বললেন, এসব বুর্জোয়া বিলাসে যোগ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বলে তিনি চলে গেলেন।

খালেদ রশীদের মধ্যে এসব পরিবর্তন যে ঘটলো তাঁকে অনেকেই সংকীর্ণতা বলতে পারে। কতকগুলো ডগমায় বিশ্বাস করা প্রায় উল্টো

মৌলবাদীও বলতে পারে কেউ। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে একজন মানুষ গোটা দেশের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। পথ ভুল হোক, ঠিক হোক, যে দেশে দশজন এমন মানুষ থাকে সে দেশের আশা থাকে। বিবেচনা করা যায়, তেমন মানুষ—একেবারে দেহে-মনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত মানুষ বাংলাদেশে এখন ক'জন আছে?

সত্তরের একেবারে শেষে কিংবা হতে পারে জানুয়ারির প্রথম দিকে সেই টালমাটাল উত্তাল দিনগুলোতে খালেদ রশীদকে কি আর একবার দেখেছিলাম? মনে করতে পারি না। অসহযোগ চলছে, বাড়ি ছেড়ে খুলনা শহরের সব মানুষ রাস্তায়, বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে এখানে-ওখানে, মারাত্মক ঘটনাও ঘটছে। একুশে ফেব্রুয়ারির দিনে দশ বছরের রাস্তার ছেলের থ্রি নট থ্রির গুলিতে ঘিলু ছিটকে পড়ছে, আট বছরের শিশুর উরু ভেদ করে গুলি চলে গেছে। তারপরে কাবুলিদের ভারী ভারী লাশ হাসপাতালের বারান্দায় গাদা করা। রূপসা নদীর ভাটি ধরে অগণ্য মানুষের লাশ ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে নাচতে বঙ্গোপসাগরের দিকে ভেসে যাচ্ছে—খালেদ রশীদ কি এই সময়টায় দু'একদিনের জন্যও খুলনায় ছিলেন? মনে হয় ছিলেন।

পঁচিশে মার্চের পর থেকে এসব আর নেই। রাজপথ থেকে মানুষ ঘরে ঢুকেছে। সন্ধের পরে খুলনা শহরের চারপাশের আকাশ লাল হয়ে ওঠে—ছাদে উঠলে দেখা যায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে শহরতলিতে, যশোর-খুলনার রাস্তার দু'পাশের বস্তিগুলোতে, আশপাশের গ্রামগুলোতে। সারারাত সাঁই সাঁই শব্দে বাতাস কেটে বুলেট প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়ে। ভারী গাড়ি চলে নিশুতি রাতে রাস্তা কাঁপিয়ে। সকালে দেখা যায় ল্যাম্পপোস্ট থেকে কালো হাফপ্যান্টপরা যুবকের মৃতদেহ বাতাসে দুলছে, সন্ধেয় ভ্যান-ভর্তি গাদা গাদা গ্রামের যুবক ভেড়ার পালের মতো শহরের দক্ষিণে বধ্যভূমিতে যাচ্ছে। এমনিই একদিনে, এপ্রিলের শেষ দিকে, খালেদ রশীদ শেষ আমার বাসায় এলেন।

কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে হিঁচড়ে তাঁকে বাসার মধ্যে নিয়ে গেলাম। আমার কন্যা দুটির একটির বয়স তখন ছয় বছর, অন্যটির চার। বড়ো বোনের সঙ্গে এক বাসায় থাকি। তাঁর তিন ছেলেমেয়ে একটু বড়ো। ছোটো ভাগ্নেটির বয়স সাতের কাছাকাছি। কী যে উৎসব পড়ে গেল বাসায় বর্ণনা করা কঠিন। ছোটো মেয়েটা তাঁর ঘাড়ে চড়ে মুখে

ক্রমাগত থাবড়া মারতে লাগলো। সবকটি ছেলেমেয়েকে তিনি চুমু খেয়ে আমার স্ত্রীকে বললেন খুব ক্ষুধা লাগছে, এক্ষুণি কিছু খেতে দিন। আমার স্ত্রী বললেন, খিচুড়ি চাপিয়ে দিচ্ছি, ইলিশ আছে, ভেজে দেব আপনাকে। একটুও দেরি হবে না। তাতে খালেদ রশীদ বললেন, সে আপনি যখন খুশি দিন—আজ আর নড়ছি না এ-বাড়ি থেকে। কিন্তু এক্ষুণি কিছু খেতে দিন। চিড়ে ভিজিয়ে দিই— আমার স্ত্রী বললেন। ভেজানো লাগবে না, চিড়ের কৌটোটা আনুন তো দেখি। বিশ্বাস করা কঠিন, সেই শুকনো চিড়ে কয়েক থাবা চিবিয়ে খেয়ে (তিনি আবার কোনো মিষ্টি খেতেন না, খুব গরম জিলিপি কিংবা গরম রসগোল্লা দু'একটি খেতে দেখেছি কখনো কখনো) এক গ্লাস পানি খেয়ে নিলেন। তারপর আমার বড়ো বোনের সঙ্গে আলাপ করার জন্য পাশের ঘরে চলে গেলেন। আমার স্ত্রীর বড়ো ভাইটাই ছিল না। খালেদ রশীদকে তিনি বড়ো ভাই থেকে একটুও তফাত করতেন না। মহানন্দে তিনি রান্না শুরু করেছেন। আমাদের ডাক পড়লে গোসল করে আমরা খেতে বসব বসব করছি, এই সময় চারদিক থেকে ভেসে এলো রাইফেলের তীব্র কানফাটা আওয়াজ। বাসার ঠিক দক্ষিণে একটি বড়ো পুকুর। পুকুরের ঠিক উপরেই একজন আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি। বাড়িতে কেউ নেই—তিনি সপরিবারে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন অনেক আগেই। টিনের বাড়ি।

ভদ্রলোকের ছিল কেরোসিনের ডিলারশিপ। ঘরভর্তি কেরোসিনে ভরা টিন। সমস্ত পাড়াটা আর্মিতে ঘিরে ফেলেছে—আগুন দেয়া হয়েছে বাড়িটায়। জতুগৃহের মতো এই অতি দাহ্য বাড়ি মুহূর্তে দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো। টিনের চালের নাটবল্টু বিকট আওয়াজে চারদিকে বুলেটের মতো ছুটতে লাগলো। কেরোসিনের টিনগুলো ফাটতে লাগলো বোমার শব্দে। বাড়া খাবার রইলো পড়ে। আমার স্ত্রী আর আমার বড়ো বোন আমাদের দু'জনকে ঠেলে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিলেন এই বলে যে, আর্মির লোকেরা এক্ষুণি এই বাড়ি ঢুকবে আর আমাদের পেলে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখবে না। কথাটা যে সত্যি তাতে একটুও সন্দেহ করা যায় না। আমি লুঙ্গির ওপর শার্ট পরে আর খালেদ রশীদ সবুজ লুঙ্গির ওপর কষে গামছা বেঁধে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। আসার সময় সকলের দিকে চেয়ে খালেদ রশীদ তাঁর তীক্ষ্ণ প্রসন্ন গলায় বলেছিলেন, আবার দেখা হবে। না, সেটা আর হয় নি।

বাসা থেকে বেরিয়ে দেখি রাস্তার ওপর শুয়ে রয়েছে পাকিস্তানি সৈন্য রাইফেলের ট্রিগারে হাত রেখে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নানা জায়গায় তারা এইভাবে শুয়ে আছে আগুন-দেয়া বাড়িটার দিকে মুখ করে। বড়ো রাস্তায় পড়তে গেলে ছোট্ট এক টুকরো ঘাস-জমি পার হতে হয়। সেখানে অনেকগুলো সৈন্য—বোঝা গেল ওরা এখুনি আমাদের গুলি করবে। কুকুরের মতো উত্তেজিত ছিল ওরা। শত চেষ্টা করেও হাত ছয়েকের বেশি ফাঁক রেখে কোনো সৈন্যের পাশ কাটানোর উপায় ছিল না। বলতে কি একজনকে প্রায় ডিঙিয়ে এসে বড়ো রাস্তায় উঠলাম। ওরা আমাদের দিকে ফিরেও তাকালো না। বাড়িটার দিক থেকেই বোধহয় আক্রমণের আশঙ্কা করছিল ওরা।

বড়ো রাস্তায় পড়তেই—মুসলমান পাড়া রোড—একটা রিকশা পেয়ে দু'জনে লাফ দিয়ে তাতে উঠে বসলাম। কোথায় যাওয়া যায় একটু ভেবে নিয়ে আমরা রিকশাওয়ালাকে যাঁর বাড়ি যেতে বললাম, তাঁর নাম আজ আমি এই লেখায় করব না। ভীষণ বিব্রত হবেন তিনি। পুরো ঘটনাটা, নিজেরই অতীত তিনি ভুলে যেতে স্বস্তিবোধ করবেন নিশ্চয়ই। আজ তিনি, সমস্ত বাংলাদেশে পরিচিত, শক্তিমান, গণ্যমান্য এবং সম্মানিত ব্যক্তি। নাম না করলে এইভাবে উল্লেখ না করেই-বা করি কি। খালেদ রশীদের শেষটুকু তো আমাকে বলতে হবে।

রিকশার হুড তুলে দিয়েছি যাতে কেউ আমাদের দেখতে না পায়। রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য চেনা লোক হাঁ করে শহরের দক্ষিণদিকের খাণ্ডবদাহন দেখছে। আগুনের লেলিহান শিখা সাপের জিভের মতো লকলক করে আকাশে উঠছে—হাওয়া উঠেছে, এক একটা প্রচণ্ড আওয়াজে টিনের বাড়ির নাটবল্টু ছিটকে পড়ছে। খালেদ রশীদ মুখের ওপর দুই বাহু ঠেকিয়ে রিকশার হুড ধরে আছেন। এর মধ্যেই পরিচিত এক অধ্যাপক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে কে, গুরু না? কোনো উত্তর দিলাম না আমরা। যে বাড়িতে যাওয়ার সেই বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। নতুন বিশাল চমৎকার আধুনিক একটি বাড়ি। আমাদের দেখে গৃহস্বামী অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে উপরে নিয়ে গেলেন। মুসলমান পাড়ার দিকে কী হচ্ছে সে খবর তিনি ও এলাকার পরিচিত কাউকে টেলিফোন করে জেনেছেন। গামছাটা কোমর থেকে খুলে ফেলে খালেদ রশীদ লুঙ্গিপরা অবস্থায় অত্যন্ত সহজ শান্তভাবে দামি সোফায় বসে একটি শস্তা সিগারেট ধরালেন। গৃহকর্ত্রী এলেন, আমরা অভুক্ত

আছি শুনে তাড়াতাড়ি কিছু খাবার এনে দিলেন। গৃহস্বামী বললেন, এর শেষ কোথায়? এরা তো কাউকে বাঁচিয়ে রাখবে বলে মনে হচ্ছে না।

আমার তখন প্রচণ্ড ক্রোধ—অস্বাভাবিক আতঙ্ক যে ছিল তাতেই-বা সন্দেহ কি—ভীষণ প্রাণভয়ে এই রাস্তাটুকু এসেছি, পরিবারের সবাই ঐ অবর্ণনীয় অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে, আর তাদের দেখতে পাবো কিনা, নিজের বাসায় ফিরে যেতে পারব কিনা তা-ও জানি না—তবু প্রচণ্ড ক্রোধ আমার, আমি বললাম, এই কুকুরগুলোকে ধ্বংস করা ছাড়া এখন কি আমাদের আর কোনো কাজ আছে? গৃহকর্তা বললেন, গতকাল রাতে আমি তো বাসায় ছিলাম না। রাত দুটোর দিকে আর্মির দুটি জিপ এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনে। তারপর দরজায় ধাক্কা। কাজের লোক দরজা খুলে দিলে সোজা দোতলায় এসে হাজির। আমার স্ত্রী তখন আলো জ্বালিয়েছেন। তিনি তখন একজন লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা মানুষকে দেখলেন আর্মির লোকদের মধ্যে। অকল্পনীয় নির্যাতনে লোকটিকে চেনার কোনো উপায় নেই, অনেকক্ষণ পরে আমার স্ত্রী তাঁকে শহরের 'অমুক মানুষ' বলে চিনতে পারলেন। ওঁর চেয়ে সম্মানিত মানুষ এই শহরে আর কে আছে বলুন? যাই হোক, আমাকে খুঁজে-টুজে না পেয়ে ওঁকে নিয়ে ওরা আবার চলে গেল। শুনতে শুনতে গৃহকর্ত্রীর চোখ চিকচিক করে উঠলো, আমাদের সেরা লোকগুলোকে মেরে ফেললো।

কিছু বিতর্ক যে হয় নি তা নয়। সন্ধে নেমে এলো। টেলিফোন করে জানা গেল, বাড়িটি ভস্মীভূত। তবে এলাকাটা এখন শান্ত হয়ে গেছে। আমাকেও ফিরে যেতে হয় বলে খালেদ রশীদও উঠে দাঁড়ালেন। সিঁড়ির নিচে পর্যন্ত নেমে এলেন ওঁরা স্বামী-স্ত্রী। ধোঁয়ার মতো আঁধারে আমি আর খালেদ রশীদ নেমে গেলাম। মোড়ের কাছে এসে আমি বললাম, গুরু, চলুন একটা রিকশা নিয়ে বাসায় ফেরা যাক। নাঃ, আমাকে ফিরতে হবে—বললেন খালেদ রশীদ। সে কি, এই অবস্থায়? আমি ভীষণ বিস্মিত। শক্ত কঠিন গলা ফিরে আসছে খালেদ রশীদের যার ওপরে আর কথা চলে না, আমাকে ফিরতে হবে এখন, সব জায়গাতে সব ব্যবস্থা করা আছে। ওঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে খুব ইচ্ছে করেছিল, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন পাথরের হিম মূর্তিকে আলিঙ্গন করা। ব্যাকুল কণ্ঠে একটা কথাই আমি জিগ্যেস করলাম, আমাকে এইটুকু বলে যান, আপনারা করতে যাচ্ছেন কী? আমার এই কথায় আবছা অন্ধকারে তাঁর ধকধকে দুই চোখের দৃষ্টি আমার মুখের ওপর ফেলে তিনি বললেন,

একবার যখন শুরু হয়েই গেছে তখন এই পাকিস্তানি কুত্তা শাসকশ্রেণির বাহিনীকে দেশের মাটি থেকে চিরকালের জন্যে উৎখাত করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ থাকতে পারে না। আমি বলছি এই কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। কথাটুকু শেষ হবার আগেই তিনি মুখ ফিরিয়েছিলেন যাওয়ার জন্য শেষ কথা কটি অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বাতাসের মতো ভেসে এসেছিল। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি এগিয়ে গেলেন। দেখলাম, অন্ধকারে মিশে গেছেন তিনি।

এই লেখার শেষটুকু আমি লিখতে পারি না। যাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের কাউকে পাওয়া গেলে হয়তো জানা যেত খালেদ রশীদ কীভাবে তাঁর পৃথিবী, তাঁর বাংলাদেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন। আমার কথা তো এর তার কাছে শোনা। শুনেছি পাকিস্তানি বাহিনীর একটা ছোটো দলের সঙ্গে ডুমুরিয়া এলাকায় যখন খালেদ রশীদের গ্রুপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, তখন ঐ খোঁড়া পা নিয়ে তিনিও গ্রুপটির সঙ্গে ছিলেন। কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়ের পর পাকিস্তানি দলটা পিছু হটে। ওদিক থেকে গুলিবর্ষণ যখন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল—অনেকটা স্তব্ধতার পর—তখন তিনিই গেলেন আসল খবরটা জানতে। আর তিনি কোনোদিন ফিরে আসেন নি। হয়তো পাকিস্তানিরা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল। একেবারে অসহায় অবস্থায় অতর্কিতে তাদের হাতে পড়ে যান তিনি। হয়তো নদীর তলায়, হয়তো সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে চলে গেছে তাঁর দেহ। হয়তো-বা নিয়ে গিয়েছিল ওরা তাঁকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে। সেখানেই ইতি ঘটেছিল তাঁর। কে বলবে? ইতিহাস কখনো কখনো ভয়াবহ পীড়াদায়ক নীরবতা অবলম্বন করে।

রফিকে আমি চিনতাম। তার আজানুলম্বিত বাহু। লম্বায় ছিল সে ছয় ফুটের ওপর। রঙ টকটকে ফরসা—বাংলাদেশের রোদে পুড়ে সেই সোনার রঙ তামাটে হয়ে গিয়েছিল। বহুদিন ধরে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না। সে যখন শ্রমিক নেতা, তখন মাঝে মাঝে তার

সঙ্গে আমার দেখা হতো। বড়ো বড়ো হাত দুলিয়ে অনর্গল হাসতে হাসতে সে কথা বলতো। সেই হাসিতে ছিল এমন এক ধরনের সরলতা যা কৈশোর পার হলে আর থাকে না। এই হাসিতে প্রকাশ পেত এক আশ্চর্য নির্লোভ ব্যক্তিত্ব। অর্থ বিত্ত আরাম-আয়েশ যশ প্রতিপত্তি ইত্যাদির লোভ এক কথায় নাকচ করতো রফির হাসি। আর এসব লোভ নিয়ে যারা পড়ে আছে তাদের দিত সোজাসুজি লজ্জা।

রফি লেখাপড়া করে নি কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা আর সংখ্যাহীন গরিবের প্রতি আগ্রহী সহানুভূতি তাকে মুহূর্তে উঁচুতে তুলে দিত। সে নিজে ছিল সম্পূর্ণ বিত্তহীন। ছোট্ট একটি ভিটে ছাড়া তার আর কিছু ছিল না। কিন্তু সে ভিটেতেও রফি থাকতো না, থাকতো শুধু ওর বিধবা মা। বাংলাদেশের ভূমিহীন মানুষের পড়ো ভিটে আর ভাঙা চালাতেই রফি বাস করতো।

রফির সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত কখন মনে পড়ে না। বোধহয় আমি ফুলতলাতে বসবাস শুরু করার পর থেকেই। তখন রফি সামান্য রাজনীতি করতো। আর সেই সঙ্গে নবাবগঞ্জে করতো আমের ব্যবসা। লাভ-টাভ যা হতো প্রাণভরে বন্ধুবান্ধবকে খাইয়ে খরচ করে দিতো। বেচারার ছিল নাটকের ঝোঁক। অভিনয় ভালো পারতো না, তবে আশ্চর্য ছিল তার চেষ্টা আর নিষ্ঠা। যে কোনো আদর্শবাদী চরিত্রের ভূমিকার জন্য ওর ছিল লোভ আর দুর্বলতা। অথচ সে জানতো না, নাটকের যে কোনো আদর্শবাদী চরিত্রের চেয়ে সে নিজে ছিল অনেক বেশি খাঁটি এবং আদর্শবাদী, অনেক বেশি অকৃত্রিম। সে সব সময়েই বিত্তহীন ভুখা মানুষের কাহিনি নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য জোর দিতো আর কেউ তা না করতে চাইলে ভীষণ খেপে গিয়ে ধিক্কার দিয়ে কথা বলতো। দরকার হলে রফি চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে পারতো। চব্বিশ ঘণ্টাই—এক মিনিট কম নয়। সহজে কিছু সে খেতে চাইতো না। আর যতো ক্ষুধার্তই হোক খাবার পেলে আশপাশের লোকদের তা বিলিয়ে দেয়ার জন্য মারামারি শুরু করে দিতো। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সময় আমি এসব খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছিলাম।

বেশ কিছুদিন ধরে রফিকে আমি দেখি নি। শুনেছিলাম সে গ্রামে গেছে। সেখানেই কাজ করে। শ্রমিক নেতৃত্ব ত্যাগ করেছিল। কাজ করছিল কৃষকদের মধ্যে। এসব কথা কানে আসতো। কিন্তু রফিকে আর আমি দেখি নি।

এরপর একাত্তরের মার্চের ২৫ তারিখ থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর নরমেধযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। বাংলাদেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজ ছেড়ে দেশের ভেতরে ঢুকে পড়লো। প্রথমদিকে পাকিস্তানিরা পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিল। পালিয়ে বেড়াতে হলো বাংলাদেশের মানুষদের। হাজারে হাজারে মরতেও লাগলো তারা, ধর্ষিত হলো অগণ্য নারী।

এই সময় শোনা গেল ফুলতলার এক জাঁদরেল নেতার মুণ্ডুচ্ছেদ করা হয়েছে। সকালে নদী পেরিয়ে একটি দল এসেছিল সশস্ত্র হয়ে। পাকবাহিনী ফুলতলায় পৌঁছুবার অনেক আগেই দুর্ধর্ষ দলটি নেতাটিকে গুলি করে হত্যা করে তার মুণ্ডু নিয়ে যায়। শোনা গিয়েছিল এই দলে রফি ছিল। বিচিত্র নয়, অসমসাহসী রফির কাছে তার নিজের জীবনের সামান্যই মূল্য।

এই ঘটনার মাস তিনেক পরে নাউলী গ্রামের হাটে রাজাকারদের হাতে রফি ধরা পড়ে গেল। কী করে এটা সম্ভব হলো জানি না। কোনো বিশ্বাসঘাতকতা ছিল কিনা তাও আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমি যেন পরিষ্কার দেখতে পাই হাটের গিসগিসে ভিড়ের মধ্যে সবাইকে ছাড়িয়ে রফির মাথা উঁচু হয়ে আছে। সেই উজ্জ্বল হাসিভরা ঘামেভেজা চকচকে মুখটি।

রফিকে খুলনার একটা বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই বাড়িটি তখন মূর্তিমান বিভীষিকা। বাড়ির সামনে দিয়েও কারো হেঁটে যাওয়ার সাহস নেই। ৫০-৬০ জন মানুষ সেখানে সবসময়েই আটকানো থাকতো। প্রত্যেকদিনই নতুন মানুষ। প্রতি রাতে এই ৫০-৬০ জন মানুষ চালান হয়ে যেতো। যেতো ফরেস্ট ঘাটে, যেতো গল্লামারী ব্রিজ ছাড়িয়ে বিলের ধারে একটি খালে। আশপাশের গ্রাম থেকে এসব নিরীহ মানুষ ধরে আনা হতো। দিন-দুপুরে বড়ো বড়ো ট্রাকে গরু-ছাগলের মতো মানুষ নিয়ে এসে ভর্তি করা হতো এই বাড়িতে। গগনবিদারী চিৎকারের আওয়াজ আসতো কখনো কখনো। ভেসে আসতো রক্তের আঁশটে গন্ধ। কিন্তু মূল বধ্যভূমি এই বাড়িটি নয়। এটা ছিল অমানুষিক অত্যাচারের কেন্দ্র, লুটের মাল বোঝাইয়ের গুদাম, রাজাকারদের ফুর্তির জায়গা। বড়ো বড়ো দাঁওয়ের বিনিময়ে মুক্ত দু'একটি মানুষ ফিরে এসে যে কাহিনি বর্ণনা করতো তাতে রক্ত হিম হয়ে যেত।

আসলে বাড়িটি ছিল বাস্তবিকই একটি নরক। এখানে ছিল অসংখ্য মেয়ে। গ্রাম থেকে ধরে আনা গৃহবধূ, কুমারী। নানা ধরনের মেয়ে। নিষিদ্ধ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে বেশ কিছু কলেজের ছাত্রীকেও ধরে এনে এই বাড়িতে রাখা হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল ফুলতলার শান্তি দাস। ওর ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল। আমি শুনেছি এই মেয়েটি চব্বিশ ঘণ্টা একটি সেমিজ আর ব্রেসিয়ার পরে থাকতো।

শান্তিকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হয়েছিল। বাংলাদেশের মেয়ে শান্তি, বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষের বোন শান্তি এভাবে তার জীবন দিয়ে গেছে। তিলে তিলে নিজের রক্তে মাংসে মজ্জায় দেশের কাছে তার ঋণ শোধ করে গেছে। নিজেকে সে পুড়িয়েছে দেহের অণুতে অণুতে। বাংলাদেশের মানুষের দিকে সেই শান্তি আজ চেয়ে আছে স্থির চোখে। আর তো ফাঁকির পথ নেই, পথভ্রষ্ট হওয়ার উপায় নেই। এইভাবে শান্তি আগামী বহু বহু বছরের জন্য এ দেশের মানুষকে বিশ্বাসঘাতকতার পথ পরিহার করার জন্য বাধ্য করবে।

কিন্তু আশ্চর্য বিবেকহীন ভণ্ড সামরিক কর্তৃপক্ষ। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়েছে পাকিস্তানি সামরিক চক্রের লোকজন বাস্তবিকই মানুষ কিনা, না মানুষের মতো দেখতে অন্য কোনো জীব। এরা এই শান্তিকে দিয়েও বন্দুকের নলের মুখে স্বীকারোক্তি আদায় করে বেতারে প্রচার করেছে, শান্তি সুখে আছে। থাক সে কথা। শুনলাম রফিকে এই বাড়িতে আনা হয়েছিল। সে ধরা পড়ার দুদিন পর একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে আমাকে বলল যে, রফিকে সে ঐ বাড়িতে দেখেছে। রফির মাথাটা বস্তা দিয়ে বেঁধে চারজন লোক তার মাথার উপর বসেছে আর দু'জন রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ধীরে সুস্থে তার দু'হাত আর দুপা ভেঙে গুঁড়ো করেছে। রফি মৃত্যু-যন্ত্রণায় চিৎকার করার সুযোগটাও পায় নি।

দুদিন পর মৃতপ্রায় রফিকে একটি জিপে করে ফুলতলা বাজারে নিয়ে আসা হয়। তাকে কেন খুলনার বাড়িতেই মেরে ফেলা হয় নি তার কারণ হিশেবে শোনা যায়, দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেয়ার জন্য রফিকে তার নিজের এলাকাতেই মারার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ফুলতলার বাজারে হাজার হাজার মানুষের সামনেই তাকে হত্যা করা দরকার। একটা হত্যা প্রদর্শনী আর কি! এই কাজে দুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। রাজাকাররা

চেয়েছিল রবিবারের হাটের দিন তাকে সারা হাট ঘুরিয়ে খুন করতে।

হাট তখন বসে গেছে। চারপাশের গ্রাম থেকে হাজার হাজার গরিব চাষি মজুর এসে জমতে শুরু করেছে ফুলতলার বাজারে। এই সময় জিপভর্তি রাজাকার রফিকে নিয়ে আসে। এই এলাকার প্রত্যেকটি মানুষ তাকে চিনতো, তখন কিন্তু তাকে দেখেও কেউ চিনতে পারে নি। চেনবার কোনো উপায় ছিল না। মাথাটা ফুলে বীভৎস, হাত-পাগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। সে মুমূর্ষু পশুর মতো আধা বসে, আধা শুয়ে। একটি মিষ্টির দোকানে এসে যখন জিপ থামলো তখন ঠাহর করে দেখে কিছু লোক রফিকে চিনতে পারে। রফি ইঙ্গিতে পানি খেতে চেয়েছিল। তাকে পানি দিলে সে কিছুতেই গ্লাস ধরতে পারে নি। এখান থেকে অসংখ্য চেনা-মানুষের ভিড়ের ভেতর দিয়ে রফিকে যখন নিয়ে যাওয়া হয়, সে তার নিভন্ত দুই বড়ো বড়ো চোখ মেলে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে সেসব তার অতি-পরিচিত প্রিয় মানুষদের দিকে বারবার দেখেছিল। যদি কোনো জাদু ঘটে যায়, যদি কেউ সাহায্যে আসে—এই শেষ সময়ে যদি কোনোরকমে সে বেঁচে যায়। আর হাটের হাজার হাজার মানুষ যাদের হৃৎপিণ্ডে লেগেছিল কঠিন মোচড়, যাদের বুকের অতলে আকাশ-ফাটানো কান্না আর আক্রোশ উথাল-পাতাল করছিল, যারা জানতো রফি তাদের ভাই, তাদের রক্ত আর মাংস, যারা জানতো রফি জীবন দিতে যাচ্ছে তাদেরই জন্য—সেই অসহায় নিরস্ত্র হাজার হাজার মানুষ ছিল নির্বাক। তারা চেয়ে চেয়ে দেখেছিল এই অসহনীয় নারকীয় দৃশ্য। রাজাকারদের নেতাটি মিষ্টির দোকানে বসে একটি একটি করে সিগারেট টেনে গিয়েছিল। উত্তেজনার চিহ্নমাত্র ছিল না তার মুখে।

রফিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নদীর তীরে একটু নির্জন একটা জায়গায়। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। রফি তার ক্ষীণদৃষ্টিতে মরজগৎ দেখছে। নদীর ওপাড়ে গ্রাম নিস্তব্ধ রয়েছে, এপাড়ে হাটের কোলাহল আবছা হয়ে আসছে তার কানে। শেষ মুহূর্তে সে তার মাকে দেখতে চেয়েছিল। তিনি ছিলেন ঘরে হতচেতন। রফি আর কোনোদিন মাকে দেখে নি।

হাত দুটি পেছনে বেঁধে তাকে উবু করে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাকে গুলি করা হচ্ছিল পেছন থেকে। সামনে নদী, বিরাট একটি গুদারা নৌকো ভৈরবের শান্ত স্রোত ধরে নিচে খুলনার দিকে নেমে যাচ্ছে। ধীর লয়ে দাঁড়ের শব্দ আসছে ছপছপ, পাখির ডাকে নির্জনতার কী

অসীম শান্তি। যারা রফির পিঠের দিকে রাইফেল উঁচিয়ে লক্ষ্য স্থির করছে, রফি তাদের বলছে, সাবধান, গুলি আমার পিঠ ফুঁড়ে মাঝিদের গায়ে লাগবে, নৌকোটাকে পেরিয়ে যেতে দাও। সূর্যের আলো তখন নিভে আসছে। ওর ছোটো চুলে ভরা মাথাটা নিয়ে যেতে রাজাকারটি বারবার পা ভেঙে পড়ে যায়।

রাজাকারদের মধ্যে ছিল একজন কসাই, সেই-ই নাকি কেটেছিল রফির মাথা। তারপর সেই কর্তিত মুণ্ডু ছাই ছাই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হাটের বিমূঢ় জনতাকে দেখাতে দেখাতে নিয়ে আসা হলো বাজারের চৌরাস্তার মোড়ে। সেখানে খোলা চত্বরে পোঁতা ছিল একটি সুপারি গাছ। একুশে ফেব্রুয়ারিতে পতাকা তোলার উদ্দেশ্যেই গাছটা ঐভাবে পোঁতা হয়েছিল। এপ্রিলের প্রথম দিকেই শহীদ মিনার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, ছিল শুধু গাছটা। দড়ি দিয়ে রফির মাথাটা বেঁধে ঐ গাছে পাকা রাস্তার দিকে মুখ করে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। রফির চোখ দুটি তখনো খোলা। এরপর কয়েকটি হ্যাজাক জ্বালিয়ে আশপাশে টাঙিয়ে দেয়া হলো।

দিনের পর দিন সেখানে রফির মুণ্ডু খোলা চোখে মানুষের দিকে চেয়ে রইলো। প্রথমদিন বাসের যাত্রীরা চমকে চেয়ে দেখলো এই দৃশ্য। তারপর থেকে তারা বাজারের মোড়ে আসার অনেক আগে থেকে বন্ধ করে ফেলতো চোখ। তাদের নাকে এসে লাগতো পচা গন্ধ।

শুনেছি রফির মৃত মুখে ছিল না যন্ত্রণার কোনো চিহ্ন। ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টের মতো সেই মুখে ভাবীকালের স্বপ্ন মাখানো। সব যন্ত্রণা থেকে মুক্ত মানুষের মুখে যে গভীর প্রশান্তি নামে সেই আশ্চর্য প্রশান্তি এসেছিল সেখানে। আশায় দীপ্ত, ভালোবাসায় মধুর, কর্মে দৃঢ় জীবনবেদ রফির মুখে ছিল লেখা। সমস্ত রক্ত ঝরে যাওয়ার পরে শ্বেতপাথরের তৈরি ভাস্কর্যের মতো শোভা পেতে লাগলো রফির মুখ। ধবধবে কাগজের মতো নিষ্কলঙ্ক নিদাগ মুখ তার, তাতে একটি দুর্জ্ঞেয় হাসির বাঁকা রেখা টানা। শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল মুণ্ডুটির আমি জানি না কিন্তু সুপারি গাছটি বরাবর পোঁতা ছিল। সেই গাছের নিচে একাত্তরের বিজয় দিবসে রফির মা। এতদিন পরে তাঁর পক্ষে চোখ ভেজানো কঠিন। মায়ের অশ্রু তো কাউকে দেখানোর জন্য নয়। শূন্য চোখে চেয়ে ছিলেন তিনি, মানুষজন আশপাশে হাঁটছিল, জটলা করছিল, হল্লা-হুল্লোড়ে ফেটে পড়ছিল। কেউ কেউ দাঁড়াচ্ছিলো তাঁর পাশে। কিন্তু তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না।

হয়তো শূন্যে, বহু টুকরো জোড়া দিয়ে, আবছা, বিভ্রান্তিকর, ছোটো রফি, বড়ো রফি, কোলের ঘুমন্ত রফি এসব নানা রফির উজ্জ্বল, জ্বলন্ত, বিবর্ণ, ছাই ছাই ছবির টুকরো জোড়া দিয়ে তিনি রফির মুখটা তৈরি করে নিতে চাইছিলেন। না, রফির মা কখনো মঞ্চে ওঠেন নি, একটিও ফুলের মালা তাঁর গলায় পরানো হয় নি। এক ইঞ্চি বাড়ে নি তাঁর ভিটের সীমানা। রফি ছিল, রফি নেই—মাত্র এইটুকু তফাত তাঁর কাছে। একদিকে জীবন, আর একদিকে মৃত্যু। বেঁচে থাকতে থাকতেই তিনি মৃত্যুর অতলে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

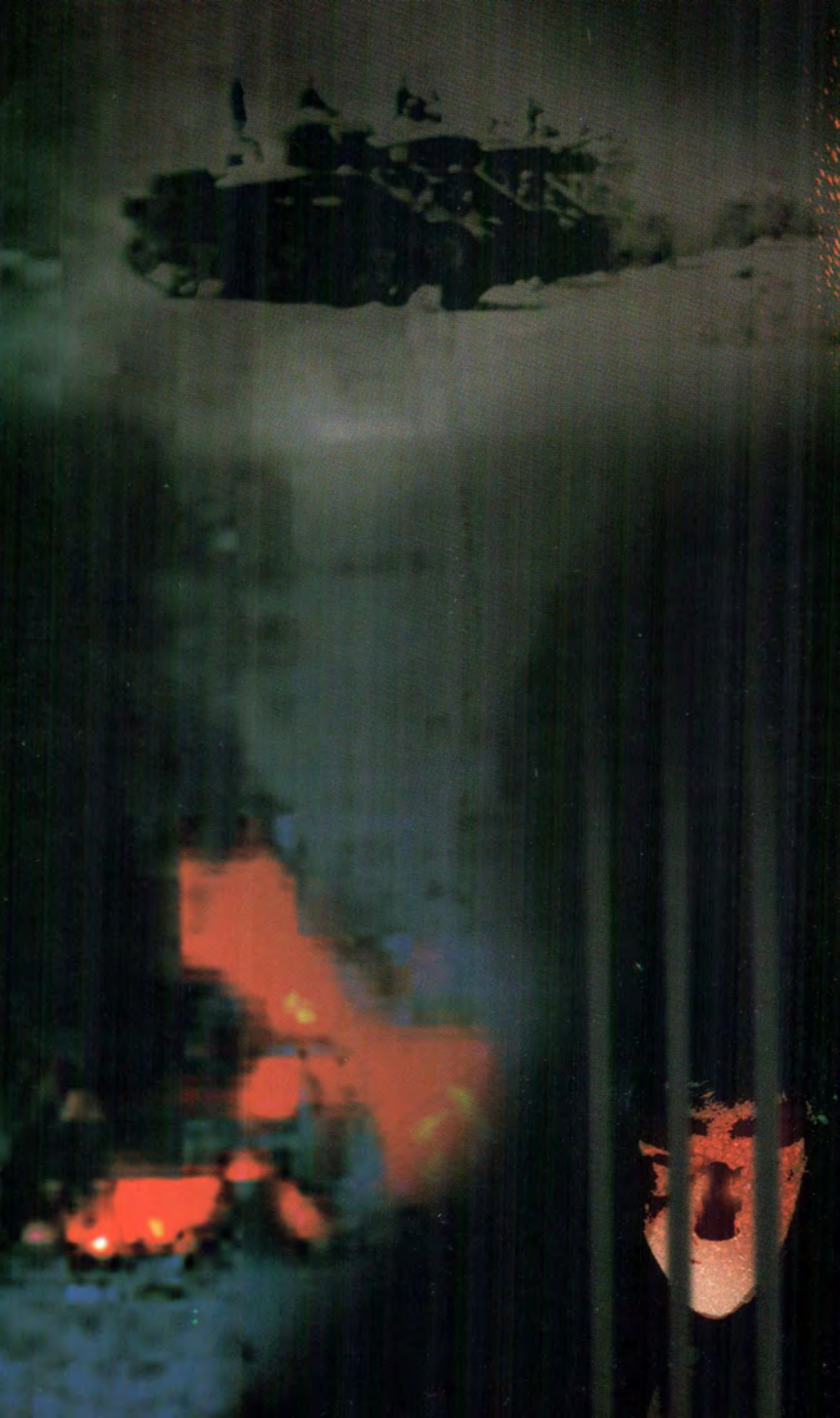

নড়াইল কলেজের অধ্যক্ষ

মোয়াজ্জম হুসাইন মে মাসের মাঝামাঝি পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে আটক হন। অধ্যক্ষের বাসভবন থেকে কিছু সৈন্য তাকে ধরে নিয়ে জিপে তোলে। দূর থেকে যারা এই ঘটনা লক্ষ্য করে তারা পরে জানায় যে অধ্যক্ষকে নিয়ে জিপ যশোরের দিকে চলে গিয়েছিল।

তার স্ত্রী, আমার বড়ো বোন, তখন এক কন্যা, দুই পুত্র নিয়ে খুলনায় আমাদের সঙ্গেই একটি বাড়িতে বাস করছিলেন। খবরটা যখন আসে আমরা তখন সবাই বাসায় রয়েছি। বলতে গেলে এপ্রিল মাসের শুরু থেকেই আমরা বাড়িতে বন্দি। নেহাত বাধ্য না হলে কেউই বাড়ি থেকে বের হই না। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সাত-আট দিনের জন্য খুলনা শহরের বাসা ছেড়েছিলাম। আমাদের দুই পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাগেরহাটের দিকে গিয়েছিলাম। কিন্তু এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই পাকিস্তানি বাহিনী রূপসা নদী পেরিয়ে এবং রূপসারই নানা খাল ধরে মূল ঘর, সৈয়দ-মহল্লা, বাগেরহাটের গ্রামগুলোতে ঢুকে পড়েছিল। দূরের গাঁ-গুলো থেকে, বিশেষ করে খালধারের গাঁ-গুলো থেকে দিনে-রাতে গানবোটের কামানের গম্ভীর বুম বুম আওয়াজ ভেসে আসত আর দেখা যেত আকাশছোঁয়া আগুনের শিখা। কবি আবুবকর সিদ্দিকের গ্রামের বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলো, যাই ঘটুক, খুলনা শহরে ফিরে যাওয়াই ভালো। তাতে মৃত্যু প্রায় একশোভাগ নিশ্চিত ছিল, পরিবারের সকলের একসঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর প্রায় কোনো উপায়ই ছিল না; কিন্তু চোখ কপালে তুলে অসুস্থ অভুক্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে মৃত্যুতাড়িত জন্তুর মতো পালিয়ে বেড়ানোর মধ্যেই ছিল হীনতা আর দুঃসহ অপমান। শেষ পর্যন্ত এপ্রিলের মাঝামাঝি খুলনা শহরে ফিরে আসি। রূপসা নদী পার হবো, এমন সময় শহরের কোথায় দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। সন্ধ্যার পরে নদী পেরিয়ে শহরের নির্জন রাস্তা ধরে, আগুন আর ছাইয়ের কটু গন্ধের মধ্যে বাসায় ফিরে আসি। তারপর থেকে আর আমরা বাসার বাইরে বেরোই না প্রায়। খুলনা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা আমার বড়ো বোন জাহানারা নওশিন তখন কলেজে যান না, আমিও যাই না দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজে। ভগ্নিপতির ধরা পড়ার খবরটা কলেজের যে হিন্দু পিয়ন ছেলেটি নিয়ে এসেছিল তাকে জিগ্যেস করে জানতে পারা গেল, অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তিনি নাকি তাঁর বাসভবনটি মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদের অস্ত্রাগার হিশেবে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। পাকিস্তানি বাহিনীর দলটি অবশ্য তাকে গ্রেফতার করার সময় সমস্ত বাসা খুঁজে অস্ত্রটস্ত্র কিছু পায় নি। তবে পিয়ন

জানালো, কথা একেবারে মিথ্যে নয়। মার্চ মাসের প্রথমদিকে ছেলেরা মাঝে মাঝে তাঁর বাসায় রাইফেল বন্দুক গুলি বারুদ এসব রাখত। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের তাতে সায় ছিল। এমনকি ২৫ মার্চের রাতে ঢাকায় ভয়ানক ঘটনার পরেও ওঁর বাসায় দু'একবার অনেক অস্ত্রশস্ত্র জমা রাখা হয়েছিল। তবে তিনি ধরা পড়ার আগে মাসখানেক বাসায় কোনোদিন কোনো অস্ত্র দেখা যায় নি।

কথা শুনেই আমি বুঝতে পারি অধ্যক্ষ সাহেবের আশা আমাদের ছাড়তে হবে। হয়তো গত দু'একদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত যা ঘটার ঘটেই গেছে। ওদের খবর সরবরাহের লোকের অভাব নেই। খুন করা যাদের নেশা, নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষদের হত্যা করতে যাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, তারা যদি খবর পায় একটা লোক মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে, তাহলে তাকে মেরে ফেলতে সময় নেয়ার কথা নয়। আমরা সবাই চুপ করে থাকি। ঘরের এককোণে বসে ভাগ্নীটি হুহু শব্দে কেঁদে ওঠে। আমি তার দিকে এগিয়ে যেতেই সে প্রথমে বিছানা থেকে নেমে মেঝেয় বসে পড়ে, তারপরে আছাড়ি পিছাড়ি গড়াগড়ি দিতে দিতে তীব্র আর্তনাদ করতে থাকে। আমার বোন অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকেন, তারপর আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে একটি একটি করে বলেন, আমাকে যেতে হবে। খবরটা পাওয়ার পর থেকে আমরা কেউ কথা বলতে পারছিলাম না। এখন একটা কথা পেয়ে আমরা প্রায় সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করি। কোথায় যাওয়া হবে, কার কাছে যাওয়া হবে, ফলই-বা কী হবে আমাদের কারও কোনো ধারণা নেই। কিন্তু আমার বড়ো বোন এই একটা কথাই বারবার বলেন, আমাকে যেতে হবে। অধ্যক্ষ অনেকদিন যশোরে ছিলেন, শোনা গেছে নড়াইল থেকে তাঁকে যশোরের দিকে আনা হয়েছে। কাজেই খোঁজখবর করতে গেলে যশোরে গিয়েই করতে হবে। কিন্তু কোনো মহিলার পক্ষে ঐ সময় ঘর থেকে বের হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না—আমার নিজের জন্যও তাই। শহরের মধ্যে দিন-দুপুরেই লোকজন থাকে না। মে মাসের দুপুরবেলার নির্জনে দু'একদিন রাস্তায় নেমে দেখেছি—ঠিক যেন মধ্যরাতের শহর, রাস্তার কুকুরগুলো উধাও, পাখিরা পর্যন্ত তখন গান ভুলে গেছে। এর মধ্যে খুলনা থেকে যশোর যাবেন একজন মহিলা তাঁর স্বামীর খোঁজে অথচ

কোথায় খোঁজ নিতে হবে সে সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আমি বারবার তাঁকে নিষেধ করি। কিন্তু ওঁকে টলানো যায় না।

আমাদের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ ওয়ালেসের বড়ো চাকরি করতেন। কলকাতায় তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল। ইংরেজিটা ভালো রপ্ত ছিল, তবে চমৎকার ছিল তাঁর মুখের উর্দু। বলতে দ্বিধা নেই বাংলার চেয়েও ভালো। আমার বোনের যশোর যাওয়ার সঙ্কল্প শুনে তিনি জানালেন, সারাদিনের জন্য তাঁর গাড়িটা তিনি ড্রাইভারসহ আমাদের ব্যবহারের জন্য দিতে পারেন। তবে কার কাছে গিয়ে খোঁজখবর করতে হবে সে বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারেন না। তখন হঠাৎ মনে পড়লো আমাদের প্রতিবেশী ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটির ছেলে আমার ছাত্র। ওরা বিহারের লোক। ছেলেটি ভদ্র, বিনয়ী, কোনোমতে বাংলা বলে। পরিচিত উর্দুভাষীদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন ততোদিনে শুরু হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত মত হামলা করার মতো গায়ে-পড়া হয়ে যাচ্ছিল, কথায় একটা কর্কশ অবজ্ঞার সুর, চাহনির মধ্যে একটা শাদা নিষ্ঠুরতা। কিন্তু বলতেই হবে এই ইঞ্জিনিয়ার পরিবারটির মধ্যে কোথাও এতটুকু ভাবান্তর আমরা লক্ষ্য করি নি। আমার ছাত্রটি কোনোদিন সামনাসামনি হয়ে মুখের দিকে তাকিয়েছে বলে মনে করতে পারি না। ওকে আমাদের বিপদের কথাটা জানানো হলো। ওর সঙ্গে দু'একটি কথা বলেই বোঝা গেল আর্মি অফিসারদের কারো কারো সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। অনায়াসেই তাকে পাকিস্তানিদের চর বলে বিবেচনা করা যেত। কিন্তু খুব স্পষ্ট ভাষায় ছেলেটি বললো, বাঙালিদের এই স্বাধীনতার যুদ্ধ তারা সমর্থন করতে পারে না। কিন্তু তারা ইয়াহিয়ার বাহিনী যা করে বেড়াচ্ছে তাকেও সমর্থন করে না। আর্মি অফিসারদের মধ্যেও দু'চারজন লোক আছে যারা বিবেক-বুদ্ধি একেবারে হারিয়ে বসে নি। তাদের অবশ্য করার কিছু নেই, তবু কখনো কখনো দু'একটি সুবিবেচনার কাজ তারা করতে পারে। ছেলেটি অধ্যক্ষ সাহেবেরও ছাত্র। সে আরো জানালো, একজন কর্নেলের সঙ্গে তার আলাপ আছে আর একজন আর্মির ডাক্তারকে সে জানে। তবে এদের দু'জনের কেউই এখন খুলনায় নেই। দু'জনেই যশোরে। আমরা যদি সরাসরি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই সে আমাদের নিয়ে যেতে পারে।

এত কঠিন পরীক্ষায় খুব বেশি আটকাইনি আগে। ছেলেটির সঙ্গে যাওয়া আর মৃত্যুর ফাঁদে পা দেয়া যে একই কথা তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। বিভাষী ছাত্রটি যে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করবে না সেটাই-বা কী করে বলা যায়? কঠিন দুঃসময়ে আমাদের বিশ্বাসের ক্ষমতা কমে আসে—মানুষ হিশেবে যেমন আমরা নিচে নামি, অন্যদেরও তেমনি টেনে নামাই। এক কথায় মানুষের ওপর থেকেই আস্থা চলে যায়। আমি হয়তো কিছুতেই ছাত্রটির কথায় বিশ্বাস করে তার সঙ্গে যেতাম না কিন্তু আমার বড়ো বোন নিজের সঙ্কল্পে এমন অটল রইলেন যে, তার সঙ্গে না যাওয়ার কোনো কথাই আর থাকলো না।

শ ওয়ালেসের বন্ধুর গাড়িতে উর্দুভাষী চালক, আমার বড়ো বোন আর আমার পাশে উর্দুভাষী ছাত্রটি। বজ্রের মতো আটকানো আমাদের ঠোঁট, গাড়িতে ওঠার সময় আমার স্ত্রী বা কন্যাদের সঙ্গে একটি কথাও নয়, ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে আমার ভাগ্নীটির ডুকরে ডুকরে করুণ কান্না—আমরা শহরের নির্জন পথ ধরে যশোর রোডে এসে উঠি। আকাশ কালো মেঘে ভরা, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, যে কোনো মুহূর্তে মুষলধারে বৃষ্টি নামবে, গাড়ির ডান-কালার কাচগুলো তুলে দেয়া হয়েছে, একটা গুবরে-পোকা কী করে গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছিল, সেটা এখন বোঁ বোঁ শব্দ করে উড়ছে আর জানালার কাচে বাড়ি খেয়ে একখণ্ড পাথরের মতো ঠক করে নিচে পড়ছে। গাড়ির ভেতরটা এত স্তব্ধ যে ওর এই বোঁ-ও শব্দ আর ঠক করে নিচে পড়া আমার কাছে বাজ-পড়া শব্দের মতো অসহ্য লাগছে। সবাই জানে, একাত্তর সালে বর্ষা নেমেছিল সকাল সকাল, বৈশাখ মাসের গোড়াতেই প্রায় খাল-বিল ভেসে যাচ্ছিল প্রবল বর্ষণে, পরিত্যক্ত জনহীন গ্রামগুলো অবিরাম ভিজছিল আর যশোর-খুলনা অঞ্চলের গ্রামগুলোর সেই যে ভয় ধরানো সবুজ, জনশূন্যতায় তা যেন আরো বুনো হয়ে উঠেছিল। এই নিরেট, প্রায়-কালো সবুজ দেখে আতঙ্ক হয়—ঝেঁপে এসে ছেড়ে যাওয়া ঘরবাড়ি ঢেকে দিচ্ছে।

বাজারের মধ্যে এসে মোড় নিতে যাবো, বাটার দোকানের সামনে ল্যাম্পপোস্টের দিকে নজর গেল। একটা মৃতদেহ তাতে ঝোলানো। খালি গা কালো হাফ প্যান্ট পরা একটি আঠারো-উনিশ বছর বয়সের

ছেলে, গলাটা তার দিয়ে বাঁধা, জলো বাতাসে অল্প অল্প দুলছে। কোনো গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে আসা কালো বাঙালি ছেলে। কোথায় তার আঘাত কিছু বোঝা গেল না। সঙ্গের ছেলেটি কোনো মন্তব্য করলো না—আমার বোন মৃতদেহটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন—মৃত ছেলেটি দুলছিল এতই স্বাভাবিকভাবে যেন বড়ো একটি গাছের পাতাসুদ্ধ ডাল দুলছে, যেন ছেলেটির অনেক কঠিন কাজ করার সঙ্কল্প ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ কাজটিই সে করেছে, সকৌতুকে মৃত্যুকেই সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে। গাড়ি দ্রুত যশোর রোড ধরে এগিয়ে যেতেই ঝমঝম করে নামলো বৃষ্টি, সেই বৃষ্টির মধ্যেই খুলনা থেকে দৌলতপুর পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে টানা যে ঝুপড়ি বস্তিগুলো ছিল সেগুলো নিশ্চিহ্ন হয়েছে দেখা গেল। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। সমস্ত এপ্রিল মাস ধরে সারাদিন এবং সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে যে আগুনের শিখা দেখা যেত, তাতে দিনের পর দিন এই বস্তিগুলোই পুড়েছে। উঁচু-নিচু ঘরের মেঝে-আঙিনা ন্যাংটো হয়ে রয়েছে। ছাইয়ের গাদা, আধপোড়া কালো খুঁটির সারি, টিনের বাটি, ঝুড়ি, চুপড়ি এসব পড়ে রয়েছে আর মাঝে মাঝে দু'একটি গলাপচা মৃতদেহ। গরু ছাগল কুকুরের দেহ তো আছেই। শকুন কুকুর মরা জন্তু খাচ্ছে, এ তো আমাদের সকলেই চেনা দৃশ্য; কিন্তু কুকুরে মানুষের দেহ ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছে এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো দৃশ্য দেখি নি। যখন চোখে পড়লো ভুক্তাবশিষ্ট মানুষের দেহ—আর সামান্যই বাকি আছে—এত অপরিচিত, এত অসঙ্গত, এত অসম্ভব এই দৃশ্য যে গাড়ির মধ্যে বসে আমার বারবার বমি আসতে লাগলো। আমাদের অধ্যক্ষ সাহেবের এই রকমই কোনো পরিণতি ঘটেছে কি। নাকি এইরকম পরিণতিই অপেক্ষা করে আছে তাঁর জন্য, হয়তো আমাদের জন্যও। আমরা কেউই কোনো কথা বলতে পারি না। যশোরের কাছাকাছি এসে যখন আমাদের বাঁ দিকে, পশ্চিমে বিল ডাকাতিয়ার বিশাল উন্মুক্তি এসে পড়লো, আমি যেন নিশ্বাসের জন্য একটু বাতাস পাই। দিগন্ত দেখা যাচ্ছে, দিগন্ত-জোড়া ধোঁয়ার মতো বৃষ্টি হচ্ছে—কাছাকাছি ভরে ওঠা বিলের পানির ওপর বৃষ্টি-ফোঁটার চরবর শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এই দেশের এই বিশালতার কাছে মানুষের জীবন কী, কতোটুকু? মানুষ কেন আটক

থাকবে? পাকিস্তানি বাহিনী কি একদিন কড়ায় গণ্ডায় মাটির কাছে তাদের অপরাধের শাস্তিভোগ করবে না?

যশোর পৌঁছে আমরা প্রথমে অধ্যক্ষ সাহেবের যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুটির কাছে গেলাম—তাঁর বিশাল বাড়ি, সম্পদ অত বড়ো বাড়িতে আঁটতে চাইছে না যেন—বাঙালির পক্ষে একটু বেমানান দৈর্ঘ্যের সেই মানুষটি যখন বাড়ির ভেতর থেকে বাইরে এলেন তখন আমি দেখলাম তাঁর কটা আর ঘোলা চোখ দুটির দৃষ্টি সাপের মতো পলকহীন হয়ে গেছে। এই মহা আমুদে লোকটিকে এককালে আমি যে বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই চিনতাম এখন আমার তা কিছুতেই বিশ্বাস হলো না। তিনি তাঁর সেই সাপের মতো পলকহীন দৃষ্টি আমার ওপরে ফেলে আশ্চর্য নিরাসক্ত নির্বিকার গলায় আমার বড়ো বোনকে বললেন, আপনার হাজব্যান্ড যে একজন গাদ্দার, ভারতীয় হিন্দুদের চর, পাকিস্তানের দুশমন তা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু গাদ্দারদের শাস্তি হতে অনেক সময় দেরি হয়—আপনার হাজব্যান্ড দেরিতে হলেও সেই শাস্তি এখন পাবেন। পাকিস্তানকে আল্লাই হেফাজত করবে। আপনি আমার বাড়ি থেকে চলে যান। কথাগুলো শুনে উর্দুভাষী ছাত্রটি পর্যন্ত লজ্জায় সিঁটিয়ে উঠলো।

বৃষ্টি একটানা চলছে। যশোর শহরের সরু সরু প্যাঁচানো রাস্তা ধরে গাড়িটা সার্কিট হাউসের দিকে আসে। রাস্তার পাশে বড়ো বটগাছটার নিচে আমরা দাঁড়াই। ছেলেটি গাড়ি থেকে নেমে ভিজতে ভিজতে সার্কিট হাউসের কম্পাউন্ডে ঢোকে। মুহূর্তের জন্য আমি ভুলে যাই, ছেলেটি উর্দুভাষী, ওখানে ওদের লোক আছে। আমার কেবলই মনে হতে থাকে ও আর ফিরে আসবে না। সার্কিট হাউসের বারান্দায় খাকিদের দু'একজনকে দেখা যাচ্ছে। অনেকটা সময় পরে ছেলেটি ফিরে এসে জানালো, ডাক্তার সাহেব বর্ডারে নাভারনে আছেন, দেখা করতে হলে আমাদের সেখানেই যেতে হবে। বর্ডারে যুদ্ধ চলছে, সেখানে যাওয়াটা একটু বিপজ্জনক বটে কিন্তু মেজর ডাক্তারটি এতই ভালো মানুষ যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারলে ব্যবস্থা একটা হবেই। এবার আর আমি কিছুতেই আমার বড়ো বোনকে সঙ্গে নিতে রাজি হই না। আমি নিজে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। আমি শেষ পর্যন্ত দেখবো, ছেলেটিকে বিশ্বাসও করব শেষ পর্যন্ত। তাতে যদি না ফিরে আসি, নাই-ই আসবো।

নিজের পরিচয় আমি সম্পূর্ণ মুছে ফেলাই স্থির করলাম। বোনকে একরকম জোর করে তাঁর এক বান্ধবীর বাসায় রেখে নাভারনের পথ ধরা গেল।

এই ভ্রমণটার বর্ণনা দেয়া আমার জন্য কঠিন। যশোর রোডের দু'পাশে ফাঁকা মাঠ, ধানের জমি, গ্রামের পর গ্রাম অবিরাম বৃষ্টিতে গলে গলে পড়ছে, মাটির প্রতিমা গলে পড়ার মতো—চোখ মুখ নাক নিশ্চিহ্ন হচ্ছে ক্রমাগত—দু'পাশে কাদাভরা রাস্তা বৃষ্টিতে ফেঁপে উঠছে— হতাশ, বিষণ্ন, অবসাদে-ভরা জনপদে রক্তের ধারা কিছুতেই দাঁড়াতে পারছে না, অনবরত ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টিতে ড্রাইভার সামনের কিছুই আর দেখতে পায় না। তার মধ্যেই লোকটা আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে গাড়ি চালায়।

নাভারনের খুব কাছাকাছি এসে মূল রাস্তা থেকে বাঁ হাতে আমাদের একটা কাঁচা রাস্তা ধরে মাইলখানেক যেতে হয়। ছোট্ট একটা স্কুল গোছের জায়গা—পাকিস্তানি আর্মির একটি ছোটো মেডিক্যাল ইউনিট। দু'তিন কামরার একটি ছোটো দালান। তারই একটি কামরায় ভাঙা একটি টেবিলে অপারেশনের দু'চারটি ছুরি, কাঁচি আর কিছু ওষুধপত্র সাজিয়ে মেজর ডাক্তারটি তার হাসপাতাল তৈরি করে নিয়েছে। একটু দূরে বোধহয় এই স্কুলটিরই আর একটি ভাঙা দালানে রান্নার ঘর আর ডাইনিংয়ের জায়গা। সেখানে কয়েকজন অফিসার বসে কথা বলছে।

মেজর ডাক্তার সাহেবটিকে দেখে আমি একটু অবাকই হই। বেঁটে, চৌকো, মজবুত স্বাস্থ্যের একটি মানুষ। বাঘের থাবার মতো হাতের থাবা। সমস্ত শরীরে পুঞ্জীভূত শারীরিক শক্তি। কিন্তু আশ্চর্য নিরীহ আর শান্ত এই লোকটি। গলার আওয়াজ মেয়েদের মতো সরু আর মোলায়েম। ওষুধপত্রের টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে এই স্বভাববিষণ্ন মানুষটি চুপ করে বসে ছিল। সঙ্গের ছেলেটি আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে পরিচয় করিয়ে দিতেই লোকটি চেয়ার থেকে উঠে এসে 'হ্যালো প্রফেসর, হাউ আর ইউ' বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বিশাল বাঘ থাবার মতো হাত, সেটা ধরতে মুহূর্তের জন্য আমার দ্বিধা হলো। লোকটির বিষণ্ন চোখ দুটির দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইলাম আমি। একটি চেয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি আবার বললেন, প্লিজ টেক ইয়োর সিট। চেয়ারে বসে এতক্ষণে আমি লক্ষ্য করি ফাটা-চটা শানের মেঝের ওপর

তিনটি কম্বলের বিছানায় তিনজন মারাত্মক আহত সেপাই শুয়ে আছে। একজনের মাথায় বিরাট ব্যান্ডেজ বাঁধা, সেই ব্যান্ডেজ চুইয়ে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসছে, কম্বলের বাইরে একজনের ভাঙা পা নিথর পড়ে আছে, আর একজন পিটপিট করে চাইছে আমার দিকে। ওদের মধ্যে কেউ গুঙিয়ে উঠতেই ডাক্তার তার কাছে গিয়ে নিচু হয়ে এমন মোলায়েম সস্নেহ স্বরে তাকে সান্ত্বনা দিল যে আমি সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। তার মৃদু বিলকুল 'ঠিক হো যায়েগা' কথা কটি আমি আজও মনে করতে পারি। নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি গভীর মমতা, জীবনের ভীষণ ক্রূরতার সঙ্গে মুহূর্তের ভারসাম্যহীন অসহায়তা— মানুষের সঙ্গে কোনো হিশাবই শেষ পর্যন্ত মেলা ভার। উঠে এসে নিজের চেয়ারে বসতে বসতে ডাক্তার বলল, অল অফ দেম হ্যাভ বুলেট ইনজুরিস, আই ডোন্ট সি এনি হোপ ফর দেম। ইটস নাও এ ম্যাটার অব আওয়ারস অনলি। এই সময় বর্ষণরত আকাশ গম্ভীর স্বরে ডেকে উঠল। আমি উদ্বেগের সঙ্গে আকাশের দিকে চাইতেই ডাক্তার আবার বলল, নো, ইটস নট থান্ডার, দে আর ইন্ডিয়ান গানস, ফায়ারিং ইনসাইড আওয়ার বর্ডার। দে আর আউট টু ডেসট্রয় পাকিস্তান। বাট উই শ্যাল ফাইট টু দি লাস্ট। দুপুরে আমাদের কিছু খাওয়া হয় নি। ডাক্তারের অনুরোধে আমাদের ডাইনিং রুমে যেতে হলো। মোটা মোটা দুটি করে হাতে তৈরি আটার রুটি আর খুব সম্ভব খানিকটা ভেজিটেবল এই ছিল লাঞ্চ। অন্য অফিসাররা হিংস্র চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। খেয়ে এসে যা বলবার আমার সঙ্গের ছেলেটি বললো, বারবার বললো অধ্যক্ষ সাহেব বড়ো শরিফ আদমি, আমরাও নাকি বড়ো শরিফ। কোথাও নিশ্চয় কিছু একটা গলদ হয়ে গেছে। আপনি নিজে একটু খবর নেবেন। তিনি অন্যায় করেছেন এ বিষয়ে আপনি যদি নিশ্চিত হন তাহলে শাস্তি হোক, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি শরিফ আদমি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই কথা বলতে বলতে ছেলেটি প্রায় কেঁদে ফেললো। সব শুনে ডাক্তার বললেন, আমার তো এখন এই জায়গা ছেড়ে নড়বার উপায় নেই। এখানে দোজ ইন্ডিয়ান বাস্টার্ডস যা করছে, তাতে কোনোদিনই আর ফিরতে পারব কিনা জানি না। এই কথা বলে ডাক্তার আরও জানালো, কর্নেল যশোর ক্যান্টনমেন্টে রয়েছেন, আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। আশা করি তিনি

একটা কিছু করতে পারবেন। অ্যাজ ফর মি, আই অ্যাম কনভিন্সড অব দি ইনোসেন্স অব আওয়ার প্রিন্সিপ্যাল। আহত তিন সেপাইয়ের দিকে গভীর মমতার সঙ্গে চেয়ে থাকতে থাকতে অনেকটা আত্মগতভাবে কথাগুলো বললো ডাক্তার। তারপর কাগজ-কলম টেনে নিয়ে লিখতে বসল চিঠি।

কিছুই তো ঘটলো না। এই প্রবল বর্ষণের মধ্যে বাংলাদেশের এক নিবিড় নির্জন মাঠে আমার মতো একজন বাঙালি চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে কে তার খবর রাখবে! তবে কি আমরা যখন বেরিয়ে যাবো বৃষ্টির অন্ধকারের মধ্যে, কামানের মেঘস্বর বেজে উঠবে, তখনই কি ঘটবে ঘটনাটা। বুলেট বেরিয়ে যাবে হৃৎপিণ্ড ছ্যাঁদা করে। চিঠি লিখে ডাক্তার সেটা ভাঁজ করে ছেলেটির হাতে দিয়ে আমাকে বিদায় দেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ইট ইজ ডেঞ্জারাস ফর সিভিলিয়ানস টু স্টে ফর লঙ ইন দি ফাইটিং জোন। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড গুড বাই। একাত্তরের যুদ্ধের মধ্যে বা যুদ্ধের শেষে ডাক্তারের কপালে কী ঘটেছিল আমি জানি না, কিন্তু যদি জানতে পারি সে তার নিজের দেশে ফিরে যেতে পেরেছিল, আমি বোধহয় এখনো অখুশি হবো না। মানুষ সামনে থাকলে তাকে চিনতে কারও ভুল হয় না। দরজা-জানালা যার বুজে এসেছে তারও নয়।

বৃষ্টির মধ্যে কাঁচা রাস্তার কাদাপানি ছিটোতে ছিটোতে আমরা যশোর রোডে উঠে আসি। দু'পাশের বহু পুরনো রেইন ট্রি-গুলো কেটে সাফ করে দেয়া হয়েছে, পুকুরে হাঁসেরা গা-ঝাড়া দিচ্ছে, বৃষ্টির চাদরে চাপা পড়ছে মাঠঘাট—এসবের ভেতর দিয়ে যশোর ফিরে যখন ক্যান্টনমেন্টের মূল গেটে এসে আমাদের গাড়ি দাঁড়ায় তখন বৃষ্টি ধরে এসেছে। আকাশজোড়া মেঘ ছিঁড়ে গেছে আর তারই ফাঁক দিয়ে রাঙা রোদ এসে ঘন সবুজ গাছপালার মাথার ওপর পড়েছে। গেটের লাগোয়া এমপি চেকপোস্ট। গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে আমি অপেক্ষা করছি। ছেলেটি গেট পার হয়ে চেকপোস্টে গিয়ে অনুমতির জন্য কথাবার্তা বলছে। একটা আতঙ্কিত জনপদে বিকেলের রোদটুকু মরে আসছে, একটু পরেই নামবে অন্ধকার, তখন কলকল শব্দে রক্তের ধারা ছুটে চলার আওয়াজ পাওয়া যাবে কান পাতলে। গাড়িতে বসে আমি

ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে যাওয়ার পিচঢালা সিধে কালো পথটি দেখতে পাই। একেবারে নির্জন, ভেতরে গাছপালায় ঢাকা অফিসারদের কোয়ার্টার। কেবলই মনে হতে লাগলো এক প্রাগৈতিহাসিক জন্তু আকাশ-পাতাল হাঁ করে আছে, তার টকটকে লাল জিভ আর পেন্ডুলামের মতো ঝুলন্ত আলজিভ দেখা যাচ্ছে। যদি অনুমতি মেলে তাহলে একটু পরে এই গহ্বরে ঢুকবো এবং জানি না বেরিয়ে আসবো কিনা। জানি না আমি ঠিক কী চিন্তা করছিলাম, সারাদিনের বৃষ্টি হাওয়ায় আন্দোলিত বড়ো গাছগুলো এখন ক্লান্ত, শালিক আর কাকেদের যাতায়াতে আকাশে মৃদু বাতাসের শব্দ। ছেলেটি এসে জানালো অনুমতি মিলেছে কর্নেল সাহেবের। গাড়ি ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে ঢুকলো, খানিকটা সিধে পথটা ধরে এগিয়ে বামে মোড় নিল, তারপর ডাইনে, তারপর আবার বাঁয়ে, তারপরে হেয়ারপিনের বাঁক, তারপর একটা দয়ের মতো হাঁটুভাঙা এক টুকরো রাস্তা, দু'পাশের বাড়ির লনের গাছগুলো থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরছে। ছেলেরা খেলতে নামে নি রাস্তায়। এদের কি ছেলেমেয়ে নেই, এরা কি সাজানো জঙ্গলে বন্দুক নিয়ে একা একা থাকে? আমরা শেষে একটা চৌকো বাক্সের মতো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় বিশালদেহী এক পাঞ্জাবি সৈনিক। তার পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা বিস্কিট রঙের পাঞ্জাবিদের শার্ট বা কুর্তা আর পাজামা। সে এত শান্ত এত বিনয়ী আর অনুগত যে, তাকে গ্রেট ডেন জাতের বিশাল কুকুরের মতো মনে হয়। লোকটি এত ভদ্রতার সঙ্গে আমাদের ড্রয়িং রুমে নিয়ে গিয়ে বসায় যে, আমি কিছুতেই ধারণা করতে পারি না স্বয়ংক্রিয় রাইফেল নিয়ে গ্রামে ঢুকে যখন একনাগাড়ে মানুষ খুন করে চলে, তখন এদের কেমন দেখায়।

একটু পরেই ডাক পড়লো ভেতরে। সৈনিকটিই আমাদের পথ দেখায়। একটি ঘর, দুটি ঘর পেরিয়ে তৃতীয় ঘরে ঢুকে দেখি অন্ধকার। তখনো আলো জ্বালানো হয় নি, একটি ছাড়া সব জানালা বন্ধ, সেই জানালা দিয়ে সন্ধ্যার সামান্য আলো আসছে। ঘরে গোটা তিনেক সোফা আছে। চোখটা অন্ধকারে একটু সয়ে এলে দেখতে পাই একটা ডোরাকাটা সাধারণ স্লিপিং ড্রেস পরে কর্নেল সাহেব বিছানায় বসে হাই

তুলছেন। অত্যন্ত অলস ভঙ্গিতে বিছানা থেকে নামতে নামতে 'এক্সকিউজ মি, মাফ কিজিয়েগা' এই ধরনের দু'একটি কথা বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন। একাত্তর সালের মে মাসে যশোর ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে এক কর্নেল সাহেবের নারীহীন, শিশুহীন বাড়িতে তার শোবার ঘরে বসে রয়েছি। মুহূর্তের জন্য হিম হয়ে গেল বুকের ভেতরটা। কর্নেল সাহেব কোনো কথা না বলে একটা সোফায় বসে হাত বাড়িয়ে মেজর ডাক্তারের চিঠিটি নিলেন। ঐ আবছা অন্ধকারের মধ্যেই পড়লেন তিনি চিঠিটা। তারপর নির্বিকার মুখে ছেলেটির দিকে চেয়ে উর্দুতে বললেন, মেজর সাহেবের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। এত তকলিফ নেয়ার কোনো কারণ তো তোমাদের ছিল না। আমরা এক সুপবিত্র দায়িত্ব পালন করছি। পাকিস্তানি বাহিনী এক ভয়ানক আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে রক্ষা করছে। দেশের যেসব গাদ্দার শত্রুকে সাহায্য করছে, তাদের উচিত শিক্ষা আমাদের দিতেই হবে। তবে পাকিস্তানি বাহিনী বিনা কারণে রক্তপাত করে না, নির্দোষের শরীর থেকে এক বিন্দু রক্ত ঝরায় না। পাকিস্তানি বাহিনী একটিই কাজ করে থাকে, সে হলো সুবিচার, সুবিচার, সুবিচার, জাস্টিস অ্যান্ড অনলি জাস্টিস। প্রিন্সিপ্যাল সাহাব দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় কাজ করলে শাস্তি পাবেন, না করলে ছাড়া পাবেন। থ্যাংক ইউ, জেন্টলমেন। কথা শুনতে শুনতে আমার বারবার মনে হচ্ছিল, আমি নিজে যদি না জানতাম, আমি নিজে যদি শিয়াল-শকুনে ছেঁড়াছেঁড়ি করে উলঙ্গ নারী শরীর খাচ্ছে না দেখতাম, এই লোকটার আয়েশি অলস জিভটাকে যদি টেনে ছিঁড়ে আনতে পারতাম ! উঠে দাঁড়িয়ে তিনি হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে, 'হোয়াট আর ইউ ডুয়িং? ডুয়িং দি সেম থিংস অ্যাজ অল বেঙ্গলিজ আর ডুয়িং নাও? ওয়ার্কিং এগেন্সট্ পাকিস্তান? বিব্রত ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বললো, হি ইজ মাই টিচার। বহুৎ শরিফ আদমি। চোখ উল্টে কর্নেল সাহেব বললেন, শরিফ আদমি! টিচার! এঃ —'

আমরা বেরিয়ে এসে দেখি টিপটিপ করে আবার বৃষ্টি হতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পরেই জোরে নামল। বড়ো বোনকে তাঁর বান্ধবীর বাসা থেকে তুলে নিয়ে বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যেই অনেক রাতে আমরা খুলনা ফিরে আসি।

এই ঘটনার প্রায় একুশ দিন পরে নোংরা শতচ্ছিন্ন পোশাকে যে কঙ্কালটি আমাদের খুলনার বাসায় ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরে আসেন, অনেক কষ্টে তাঁকে আমরা অধ্যক্ষ সাহেব বলে চিনতে পারি। তিনি এবং খুলনার স্কুল অব মিউজিকের প্রতিষ্ঠাতা আজিজ খান একদিনে ছাড়া পান। তাঁদের ওপর কী ঘটেছে, তা তাঁরা বলতে চাইলেও আমি কোনোদিন শুনতে চাই নি। একদিন শুধু অধ্যক্ষ সাহেবের কাছে শুনেছিলাম, একটি বড়ো ঘরে অনেক লোককে এক সাথে আটকে রাখা হতো। রাতে আলো দেয়া হতো না ঘরে। ভেড়ার পালের মতো মেঝেতে অন্ধকারের মধ্যে গাদাগাদি করে বসে থাকতেন তাঁরা। রাত নয়টার দিকে দরজা খুলতো—তীব্র একটা টর্চের আলো ঘুরে বেড়াত মানুষগুলোর মুখের ওপর দিয়ে। তারপর থামতো হঠাৎ কোনো মুখের ওপর, টর্চের পেছনে একটা কণ্ঠ শোনা যেত, তোম আ যাও, টর্চের আলো পড়তো আর একটি মুখের ওপর, তোম আ যাও, আবার একটি মুখের ওপর, তুম্ ভি। বাঘের মতো লাফিয়ে এসে কয়েকজন জওয়ান টেনে-হিঁচড়ে চিহ্নিত লোকগুলোকে ঘরের বাইরে নিয়ে যেত। রক্ত হিম করা আর্তচিৎকার কোনোদিন শোনা যেত, কোনোদিন যেত না। কিন্তু তারা আর কখনো ফিরে আসতো না।

যেমন হয় আর কি বাইরে

থেকে সবকিছুই শান্ত ছিল, দৌলতপুর

ব্রজলাল কলেজের লাল রঙের দালানগুলোর দরজা-জানালা পুরোপুরি বন্ধ থাকলেও তাদের নিস্তব্ধতার মধ্যে শান্তি ছিল, কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে ঘাস বেড়ে উঠে জঙ্গল জায়গায় জায়গায় আধ-মানুষ উঁচু হয়ে উঠলেও শীতের দুপুরের ঠাণ্ডা

রোদে গাছের ছায়ায় বসে গরু-ছাগলের জাবর-কাটা দেখলে মনে হওয়ার কোনো উপায় ছিল না যে দেশের ভেতরে রক্তের বন্যা বইছে। এই শব্দহীনতার মধ্যে একটুখানি সময়ের জন্য কান পাতলে পাশের বাজারের উষ্ণ জীবনস্রোতের আওয়াজ আছড়ে পড়তে এবং ফিরে যেতে শোনা সম্ভব ছিল। মানুষের ভিড়ে একেবারে হারিয়ে-যাওয়া, শুকিয়ে-ওঠা নদী ভৈরবের জোয়ারের পানি বাড়ার একটা আশ্চর্য গম্ভীর শব্দ শুনতে পাওয়াও তখন অসম্ভব ছিল না। এরই মধ্যে একদিন একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসের তিন কি চার তারিখের সকালবেলায় ছেঁড়া এক টুকরো কাগজে অধ্যক্ষের একটি নোটিশ, তাতে সাতজন শিক্ষকের নাম লেখা। আমার নাম দু'নম্বর, তাতে বলা হয়েছে, খুলনা সার্কিট হাউসে যে পাকিস্তানি কর্নেলটি অবস্থান করছেন তিনি এই সাতজন শিক্ষকের সঙ্গে একটি সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই কথা লিখে অধ্যক্ষ যোগ করেছেন যে কর্নেল সাহেবের ইচ্ছা তাঁর আদেশেরই অন্য নাম।

ইংরেজিতে লেখা নোটিশটি প্রথমবার পড়েই সম্পূর্ণ অর্থবোধ হলেও কেন যে পরপর তিনবার পড়তে গেলাম এবং তিনবার পড়ার পরে কেন যে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না জানি না। নোটিশের কাগজটা চোখের সামনে থেকে উবে যেতে লাগলো, হাতে ধরা কাগজ অদৃশ্য হতে হতে প্রায় আর নেই, ডানদিকের কোনোটা গেলেই পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায় আর কি, এই সময় বাজারের কল্লোল আর পাশের ভৈরবের খেয়াঘাটের মাঝিদের চিৎকার একসঙ্গে কানে আসে, হাতের নোটিশটি খড়খড় আওয়াজ করে ওঠে। চেয়ে দেখি নোটিশে সাতজনের দুইজন সই করেন নি, তাঁরা কলেজ ক্যাম্পাসে থাকতেন না, বাকিরা সবাই সই করেছেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি অধ্যক্ষের বাড়িতে চলে এলাম। কালো শীর্ণ লম্বা মানুষটি বিবর্ণ মুখে একটি বেতের কৌচে বসে আছেন। বসে আছেন না বলে শুয়ে আছেন বলাই ভালো। চোখ দুটো আধবোজা। আমি সোজা তাঁর কাছে গিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বললাম, এটা কী হলো স্যার? আপনি নিজের হাতে যমের সমন লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। একটুও না নড়ে, বোজা চোখ না খুলে শুধু হাত দুটি চিৎ

করে দিয়ে তিনি ভাঙা গলায় বললেন, আমি কী করবো?

আমি কী করবো মানে, আপনি আমাদের দিকটা দেখবেন না?

উত্তেজনার মধ্যে এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নি যে আমি ছাড়া বাকি যে চারজন সই করেছেন অধ্যক্ষের নোটিশে তাঁদের তিনজন এর মধ্যে এসে গেছেন। ঘরের দরজা-জানালা প্রায় সবই বন্ধ, এই সকালবেলাতেও ঘর আবছা অন্ধকার, তার মধ্যে এখানে-ওখানে একটা করে চেয়ার টেনে নিয়ে তাঁরা বসে আছেন। এই সময়ে হন্তদন্ত হয়ে এলেন চতুর্থ ব্যক্তিটি। এই মানুষটি পুরো ছয় ফুট লম্বা, পেটানো শরীর, এঁর দিকে তাকিয়েই বলা যায় প্রশস্ত বক্ষকপাট শব্দবন্ধ কেন ব্যবহার করে মানুষ। দুর্ধর্ষ প্রকৃতির বলে বিশেষ নাম ছিল এঁর। সবসময়েই কাছে রাখতেন একটি পিস্তল। গত নয় মাসে অবশ্য সেসব কোথায় গেছে। কাছে আসতেই দেখলাম স্নায়ু বিপর্যয়ে তিনি এতটাই বিচলিত যে সকালের দরকারি কাজগুলোও শেষ করতে পারেন নি। গালের একটা দিক কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে সেখান থেকে, অন্য দিকটাতে তখনো সাবান মাখানো। অধ্যক্ষের কাছে এসে সিংহগর্জনে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি কেন স্যার নোটিশ পাঠাতে গেলেন?

অধ্যক্ষ আবার ভগ্নকণ্ঠে বললেন, আমি কী করবো? আমার ঘাড়ে কটা মাথা? একটু সিধে হয়ে বসে তিনি আমাদের দিকে চেয়ে চোখ মিটমিট করতে থাকলেন, জানানোর কথা জানিয়ে দিয়েছি। ধরে নিন্ না আপনারা নোটিশ পান নি, আপনারা যাবেন না। কিংবা নোটিশ পেয়েও তো আপনারা না যেতে পারেন, আমি তো আপনাদের বাধ্য করছি না।

ঘাড়ে মাথার হিশাব তো আমাদেরও করতে হবে।

তাহলে আর আমি কী করবো? এবার তিনি কৌচের ওপর পুরোপুরি শুয়ে পড়লেন।

বোঝা গেল অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই কিছু। দুর্ধর্ষ শিক্ষকটি তখনো কাঁপছেন। সেটা রাগে-ভয়ে না ভেতরের অস্থিরতায় জানি না। একজন শিক্ষক তাঁকে বললেন, কাটা গাল থেকে রক্ত পড়ছে, একটু ডেটল-মেটল লাগিয়ে আসুন। অন্যদিকের দাড়িটাও কাটা দরকার।

একটুও বিব্রতবোধ করলেন না সাহসী অধ্যাপকটি, বললেন, হুঁ, দাড়ি-কাটা দেখছেন। প্রাণ গেলে দাড়ি-কাটা নিয়ে কী হবে?

আমি বললাম, সে তো হলো, আমরা এখন কী করবো? যাবো, না যাবো না?

অধ্যক্ষ কৌচ থেকে মাথা তুলে বললেন, সার্কিট হাউস থেকে আমাকে টেলিফোন করেছিল। দশটার মধ্যে যেতে হবে। জিপ পাঠাবে কিনা জিগ্যেস করছিল। আমি সাথে সাথে না করে দিয়েছি।

সেটা আপনি ঠিকই করেছেন, জিপ এলে ধরে নিয়ে যেত আর কি! আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপকটি বললেন।

আজ জানি না কেন সার্কিট হাউসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কলেজ ছেড়ে একদিকে চলে গেলেই হতো। ভৈরব পার হয়ে ওপারের নিবিড় গাছপালায় ভরা গ্রামগুলোতে ঢুকে গেলে কে আমাদের বের করতে পারতো? হয়তো ছোট্ট মেয়ে দুটির কথা মনে হয়েছিল, কোলের ওপর হাত দুটি জড়ো করে তিরাশি বছরের যে বৃদ্ধ, আমার বাবা, ইজি চেয়ারে সারাদিন বসে থাকতেন, তাঁর কথা মনে হয়েছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা যে কোনো উৎকট নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে এ বিশ্বাস তখন আমাদের একেবারে পুরোপুরি হয়ে গেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে সার্কিট হাউসের গেটে রিকশা থেকে নামছি, দেখতে পেলাম গেট পেরিয়ে বাঁ হাতে মাঠের মধ্যে মিলিটারির বিরাট কালো ভ্যানটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে আর কোনো সন্দেহ রইলো না। একবার আকাশের দিকে চেয়েছিলাম এখনো মনে আছে। ডিসেম্বরের উজ্জ্বল রোদে ভরা। পরিচ্ছন্ন খুলনা শহরের বাড়িঘর ডুবে আছে তার মধ্যে, একধরনের ঘোর-লাগা তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে। একটা উদাসীন তন্দ্রাচ্ছন্নতা যেন আমাকেও মুহূর্তের জন্য গ্রাস করলো। মনে মনে বিদায় জানালাম পৃথিবীকে। এই কালো ভ্যান গাড়িটিকে সবাই চেনে। এটা কসাইখানার গাড়ি। সকালে দুপুরে সন্ধ্যার আলো-আঁধারির মধ্যে আমি অনেকবার এই গাড়িটিকে ঠাসাঠাসি মানুষ বোঝাই করে নিয়ে যেতে দেখেছি। বেশিরভাগই যুবক—আশপাশের গাঁ থেকে ধরে নিয়ে আসা হতো ওদের, খালি গায়ে সারি সারি নির্বাক বসে আছে। ওদের নিয়ে যেত শহর পেরিয়ে দক্ষিণে গল্লামারীতে—ভৈরবের একটি খাঁড়ির ধারে। গাড়িটি এখন সকলের কাছেই সাক্ষাৎ যমদূত।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে যখন এসব বিভীষিকার ছবি দেখছি, ঠিক

তখনি একবার একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছে জাগলো যে ডান হাতের পিচঢালা রাস্তা দিয়ে তীব্রবেগে দৌড় দেই। পরের মুহূর্তেই কিন্তু আমি গেটের ভেতর দিয়ে সার্কিট হাউসে ঢুকছি, আমার পাশে ঘাবড়ে-যাওয়া সহকর্মীটি। এখন তিনি শান্ত গম্ভীর উদ্বেগশূন্য। অন্তত আমার তাই মনে হলো।

সার্কিট হাউসের বড়ো ঘরটিতে গিয়ে দেখি অনেকেই সেখানে হাজির হয়েছেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষক, দু'একজন অধ্যক্ষ, আইনজীবী, ডাক্তার সব মিলিয়ে পঁচিশ তিরিশজন হবে। জাল ফেলেছে মন্দ নয়— এই ক'জনকে সাবাড় করতে পারলে খুলনা শহর একরকম পরিষ্কার করে ফেলা যায়। সন্তর্পণে কথাবার্তা বলছেন সবাই, নিচু গলায়, মাথা নিচু করে, পাশের মানুষের দিকে আড়চোখে চেয়ে। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা প্রায় সবারই—কিন্তু একটা ভীষণ আতঙ্ক মাঝে মাঝেই ছায়া ফেলছে ওঁদের হাস্যোৎফুল্ল মুখের ওপরে, উপরে না বলে বরং বলা যায় প্রফুল্লতার আবরণের ঠিক তলায় কাজ করছে এই আতঙ্ক। নিজের কঙ্কালের দিকে চাইতে চাইতে যেন অন্যের সঙ্গে রসালাপ করা।

উর্দি-পরা এক তরুণ অফিসার বুটের খটখট শব্দ তুলে মাপা পায়ে আমাদের ঘরের দরজার কাছে এসে কদর্য ইংরেজিতে জানালো আর কিছুক্ষণের মধ্যে কর্নেল সাহেব আমাদের সঙ্গে যথাবিহিত কথাবার্তা বলবেন। ছোকরা অফিসারটি সুপুরুষ। বয়স খুবই কম, তার ফরসা মুখটি ঘামে তেলাটে, চোখের দৃষ্টি থেকে একই সাথে নির্বুদ্ধিতা, দম্ভ আর হিংসা ফুটে বেরোচ্ছে। ঠিক এই সময় দেখলাম খুলনার ডি.সি. রশীদুল হাসান ঝড়ের বেগে বারান্দা পার হয়ে কর্নেল সাহেবের ঘরে ঢুকে গেলেন। খোলা দরজা দিয়ে দেখলাম রশীদুল হাসানের পোশাক এলোমেলো, চুল অবিন্যস্ত। আমাদের দিকে একবারও চোখ ফেরালেন না। ওঁকে চিনতাম আমি। ১৯৫৯ বা '৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ইংরেজি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমরা অংশ নিয়েছিলাম। আমাকে তাঁর মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু তিনি দাগ কেটেছিলেন আমার মনে। খুলনার ডি.সি. হিশেবে নতুন করে পরিচয় হয় তাঁর সঙ্গে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্নেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রশীদুল হাসান। এবার তিনি খোলা দরজার কাছে এসে আমাদের দিকে

তাকালেন। রাগে উত্তেজনায় না ক্ষোভে, আমি জানি না, তাঁর মুখ টকটকে লাল, যেন রক্ত ফেটে পড়বে, দুই চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, ঘাম গড়িয়ে পড়ছে মুখ বেয়ে। একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়েছিলাম আমি, চেষ্টা করছিলাম তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কিছু আন্দাজ করতে। আমার ওপরেও চোখ পড়লো তাঁর, কিন্তু আমাকে চিনলেন বলে মনে হলো না। বারান্দার অন্য প্রান্তে চলে গেলেন তিনি। একটা অসহ্য নিস্তব্ধতা নেমে এলো ঘরের মধ্যে। এতগুলো লোক এই ঘরে, এতক্ষণ কথা বলছিল সবাই, হঠাৎ একসঙ্গেই সবাই থেমে গেল। দেয়াল ঘড়ির টকটক আওয়াজ এখন কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে, একটি শিশুর কান্না যেন অন্য জগৎ থেকে এসে এই ঘরের স্তব্ধতা ভেদ করে কানের ওপর আছড়ে পড়লো। আমার কেমন লাগছিল আমি কিছুতেই বলতে পারবো না। ভয়, শঙ্কা, আতঙ্ক ইত্যাদি শব্দ দিয়ে মনের অবস্থাটা বোঝানো যাবে না। কারণ মন সত্যিই এরকম কোনো পরিচিত অবস্থার মধ্যে ছিল না। একবার যেন আবছা মনে হলো জন্ম থেকে যে রহস্যের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছি, কী আছে জীবনের শেষে, সেই রহস্যের একটা সুরাহা হতে যাচ্ছে।

যতোদূর মনে পড়ছে রশীদুল হাসান যেন ফিরে এসে আর একবার কর্নেলের ঘরে ঢুকেছিলেন। ঠিক মনে করতে পারি না। আমাদের ঘরের দরজার সামনে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলার জন্য উদ্যত হয়েই তিনি সরে গেলেন ওখান থেকে। তারপরে কর্নেলের ঘরে যাওয়ার জন্য আমাদের ডাক পড়লো।

আধো অন্ধকার ঘরে কর্নেল সাহেব ভেলভেট মোড়া বিরাট একটি টেবিলের ওধারে বসে। প্রথমটায় তাঁকে আমি দেখতে পাই নি। ঘরে আমাদের ঢোকাটা খুবই বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। চৌকাঠের কাছে এসে হোঁচট খেলেন কেউ, দরজার ভারি পর্দা জড়িয়ে গেল কারো পায়ে। ঘরের ভেতরটায় অন্ধকার, সকলের বসার চেয়ারও নেই সেখানে। অন্ধকার চোখে একটু সয়ে এলে কর্নেল সাহেবকে দেখতে পেলাম আমি। মাঝারি গড়নের মধ্যবয়স্ক মানুষ, খুব ফরসা, পাতলা চুল, মাঝখানে সিঁথি কাটা। বারবার বলতে লাগলেন, প্লিজ হ্যাভ ইয়োর সিটস, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড দি ট্রাবল আই হ্যাভ গিভ্‌ন য়্যু। সকলের ঘরে

ঢোকা হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নীরবতা নেমে এলো। যে যেখানে ছিল জমে যেন পাথর। কর্নেল সাহেবের ঠোঁটে হালকা হাসির একটি করে ঢেউ উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটিও হাসছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু হাসিটা মুছে যেতেই কী যে ভয়ানক বিজাতীয় লাগলো মুখটা, যেন মানুষের মুখই নয়, অন্য কোনো প্রাণীর মুখ—চোখের দৃষ্টি ঠাণ্ডা হিম ক্রূর আর সমস্ত মুখটাই যেন একটা মুখোশ, তার আড়ালে কদর্য স্থূল এক রক্তুপ রাক্ষসের মুখ। হয়তো এসব কিছুই ঠিক নয়, আমি কল্পনা করে থাকবো।

কর্নেল মুখ খুলতেই বোঝা গেল, যে কারণেই হোক আমাদের রেহাই দেয়া হয়েছে। খুবই ধীর শান্তভাবে তিনি একটি বক্তৃতা দিলেন : য়্যু আর টিচার্স, য়্যু আর ইন্টেলেকচুয়ালস, য়্যু আর দি মোস্ট ওয়ার্দি সিটিজেনস অব পাকিস্তান। দি নেশান ইজ গ্রেটফুল টু য়্যু, দি নেশন নিড্‌স ইয়োর হেলপ ইন টাইম অব ক্রাইসিস। উই আর নাউ ইন এ ক্রাইসিস, ইন্ডিয়া ইজ ট্রাইং হার বেস্‌ট টু ডেসট্রয় পাকিস্তান—এইরকম এক গাদা কথা বলেও তিনি খুশি হলেন না—একটা বিরক্তি আর চাপা রাগ তাঁর চোখে-মুখে থেকেই গেল। খোদা পাকিস্তানকো হেফাজত করে—এই জাতীয় কিছু একটা বলে তিনি আমাদের বিদায় দিলেন।

আজ আমি ঠিক জানি না, পালানোর মুখে আমাদের ২৫-৩০টি মানুষকে মেরে ফেলার ঝামেলা নিতে চান নি বলেই কর্নেল সাহেব আমাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন, না রশীদুল হাসান কোনো না কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করে এই হত্যাকাণ্ড রদ করেছিলেন। রশীদুল হাসানের বাবা আমাকে ঠিক এই কথাটিই লিখেছিলেন। আমি তখনো জানতাম না, আজো জানি না। বৃদ্ধকে আমি নিঃসংশয়ে কিছু জানাতে পারি নি। কিন্তু রশীদুল হাসানের ব্যাকুল মুখটি আমার মনে পড়ে। আমি এইটাই ভাবতে চাই যে সেদিন তাঁর চেষ্টার ফলেই আমরা সার্কিট হাউস থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিলাম।

একাত্তরের ডিসেম্বরের

ছয় কি সাত তারিখ এতদিন পরে আর

ঠিক মনে পড়ে না, সন্ধের মুখে আমি পাকিস্তানি বাহিনীর প্রথম ট্যাঙ্কটি দেখতে পাই। দৌলতপুর কলেজের লোহার গেটের কাছে আমি দাঁড়িয়ে, দু'পা দূরে পুরনো যশোর রোড, তারপরে কলেজ রেলস্টেশন, ওখান থেকে কয়েক গজ দূরে

খুলনা যাওয়ার নতুন বড়ো রাস্তা, তার মানে নতুন যশোর রোড। কলেজ গেট থেকে নতুন রাস্তার দূরত্ব, রেললাইনটা পেরোতে হলেও, চল্লিশ গজ হবে কিনা সন্দেহ। ট্যাঙ্কটা খুব স্পষ্ট দেখতে পাওয়ারই কথা। কিন্তু শীতের বিকেল খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়, অন্ধকার নামার আগেই কোথা থেকে আসে কুয়াশার চাদর, ট্যাঙ্কটা যতোটা না দেখতে পাই তার চেয়ে অনেক বেশি শুনতে পাই কর্কশ ভারি আওয়াজ আর অনুভব করি পায়ের নিচে মাটির কাঁপুনি। বিশাল একটা গুবড়ে-পোকার মতো ট্যাঙ্কের আকার আর দু'একটি সৈন্যের আবছা চেহারা এইমাত্র দেখা গেল। পেছনে লাগালাগি আর একটি ট্যাঙ্ক, তার পেছনে আরো একটা। তারপরে একটির পর একটি। আলো নেই, সন্ধের ছাই রঙের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ দিকে, খুলনা শহরের দিকে যাচ্ছে। সমস্ত যশোর এলাকা থেকে এটা যে পাকিস্তানি বাহিনীর পিছু হটে আসা সেটা তখনি বোঝার উপায় ছিল না। পালানোর সময়ে পাকিস্তানি বাহিনী খেপা কুকুরের মতো আচরণ করতে পারে এটাও আমার আন্দাজ হয় নি। আদতে ওরা নয় মাস ধরে বাংলাদেশে খেপা কুকুরই ছিল, মানুষ ছিল বলা খুবই কঠিন। বরং পালানোর সময় হয়ে গিয়েছিল কোণঠাসা ইঁদুর। আমি প্রায় সাতদিন ধরে এই নেংটি ইঁদুরদের দেখেছি। শিরোমণিতে যে শেষ যুদ্ধ হয়েছিল তাতে ওদের থেঁতো হয়ে যাওয়া ইঁদুরের মতো ছিন্নভিন্ন লাশও দেখেছি। কিন্তু তা দেখেছি ক'দিন পরে, এগারো বারো তারিখের দিকে।

সন্ধের ঠাণ্ডার মধ্যে আমি একা দাঁড়িয়ে থাকি। কোথাও একটি মানুষ নেই—খুব সন্তর্পণে দু'একটি কুকুর রাস্তা পেরোচ্ছে। একজন সৈনিকও দেখা যায় না। হেডলাইটের তীব্র আলো ভুতুড়ে—দূরের ধুলোমাখা ঝোপঝাড় বিবর্ণ দেখাচ্ছে—কংক্রিটের রাস্তা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। দেখতে দেখতে আমি যখন প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তখন আবার আসতে শুরু করলো ট্যাঙ্ক—কংক্রিটের রাস্তার ওপর লোহার চেন বিকট শব্দ তোলে—আমার হাড়ের মধ্যে রি রি করতে থাকে।

মনে করে দেখছি, আমি প্রায় তিন ঘণ্টা গেটের দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনীর এই পলায়নদৃশ্য দেখছিলাম। ভ্যানে,

ট্যাঙ্কে, জিপে নির্জন রাস্তা পরিপূর্ণ—শুধুই যন্ত্রের শব্দ, ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ, লোহার ঘষটানির কর্কশ শব্দ; কিন্তু মানুষের কণ্ঠ নেই। পুরো ব্যাপারটাই যেন দম-দেয়া, স্বয়ংচালিত। আমার কাছে প্রায় অনৈসর্গিক মনে হচ্ছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল এই অন্তহীন যানবাহনের সারির মাথা খুলনা শহরে পৌঁছে গেছে—পেছনের দিকে কতোদূর আছে তা আন্দাজ করবার কোনো উপায় নেই। তখনো পর্যন্ত চমৎকার শৃঙ্খলা—কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কোনো চেষ্টা করছে না।

কতোক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি, ট্যাঙ্কের পিঁপড়ের গতি আমার একঘেয়ে লাগতে লাগলো। হঠাৎ ফিরে পা চালিয়ে আমি একটু দূরে অধ্যক্ষের বাড়িতে ঢুকলাম। ভদ্রলোকের পরিবার সঙ্গে ছিল না, বাড়িটিতে তিনি একাই থাকতেন। নির্জন অন্ধকার ঘরগুলো পেরিয়ে দোতলায় উঠে তাঁর ঘরের দরজা ঠেলে আমি ভেতরে ঢুকি। এক কোণে একটা হারিকেন থেকে লাল ম্যাটমেটে আলো আসছে, অধ্যক্ষ নিজের বিছানায় মড়ার মতো পড়ে আছেন। আমি উত্তেজিত গলায় বলি, স্যার, পাকিস্তানি আর্মি রিট্রিট করছে। কথাটা শুনেই তিনি স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন, অতি দ্রুত ঝুঁকে লম্বা হাত বাড়িয়ে স্টেশনের দিকের জানালা খুললেন, তারপর ঠিক পাগলের মতো জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে পাকিস্তানি আর্মির উদ্দেশে ঘুষি ছুড়তে ছুড়তে বলতে থাকলেন, জুতা মার্, জুতা মার্, জুতা মার্। এরকম করে বাতাসে ঘুষি ছুড়তে ছুড়তে উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে এলে তিনি আমার দিকে ফিরে অনুচ্চার্য গ্রাম্য ভাষায় বললেন, মেয়েমানুষের মাংস ছিঁড়ে খায় যে জাতির সৈন্য, সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

কিছুক্ষণ পরে অধ্যক্ষের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি আবার কলেজের গেটের সামনে এসে দাঁড়াই। ভেতরের উত্তেজনা কিছুতেই বশে রাখতে পারছি না। ট্যাঙ্কের বহর শেষ হয়েছে, এখন চলেছে কবন্ধের মতো বিশাল বিশাল ভ্যানগুলো। এর মধ্যেই অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এসেছে। গাড়িগুলোর চোখ এখন আধবোজা—হেডলাইটের উপরের অর্ধেকটায় কালি মাখানো। লাল ঠাণ্ডা আলোয় অন্ধকারের

মধ্যে সরু একটা সুড়ঙ্গ তৈরি হয়েছে। সেই উদ্ধারহীন সুড়ঙ্গপথে পিঁপড়ের সারির মতো চলেছে পাকিস্তানি বাহিনীর যানবাহন। মানুষের চেহারা আবছা দেখতে পাচ্ছি। দেখতে দেখতে আবার ক্লান্তি এসে গেল। একটানা মৃদু ইঞ্জিনের শব্দ, রাস্তায় রাবারের চাকা ঘষার আওয়াজ, মানুষ বা প্রকৃতির কোনো শব্দ নেই, শুধু যন্ত্রের কী রকম একটা বুকচাপা গুমড়ানো শব্দের প্রবাহ। আমি বাসায় ফিরে এলাম। ব্ল্যাক আউটের ঘুটঘুটে অন্ধকারে বাড়িঘর ডুবে আছে।

সে রাতে ঘুমের মধ্যে আমার চেতনা বাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেললো ঠিকই, কিন্তু একটা মুহূর্তের জন্যও পুরোপুরি লুপ্ত হলো না। মগজের নিচে থেকে চারপাশে বেড় দিয়ে আমার অর্ধলুপ্ত চেতনা একটা পাকদণ্ডীর রূপ নিল। সেই পাকদণ্ডী বেয়ে সমস্ত রাত ধরে উপরের দিকে উঠতে লাগলো ভারি ভারি ট্যাঙ্ক, মিশমিশে কালো জাহাজের খোলের মতো ভ্যান আর খাকি রঙের অন্তহীন জিপের সারি। ঘুমের মধ্যে নিথর পড়ে রইলো আমার শরীর, মাথার ভেতরে এক অলীক অসম্ভব উদ্ভট জগতে চেতনার চওড়া পাকদণ্ডী বেয়ে চলতে লাগলো একটানা ঘর্ঘর শব্দ।

ইঞ্জিনের শব্দ কখনো ওঠে, কখনো নামে, ট্যাঙ্কের শেকলের ঝনঝন শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দেয়—জিপগুলোর চাপা গর্জন দীর্ঘশ্বাসের মতো বাতাসে মিলিয়ে যায়। সারারাত ধীর লয়ে সমস্ত গাড়িঘোড়া বুকের ওপর দিয়ে চলে যায়। ঘুম, জাগরণ আর আচ্ছন্ন একটা অবস্থার মধ্যে হিজিবিজি টানা স্বপ্ন দেখি—বালিয়াড়ি ধসে পড়ছে—প্রচণ্ড খরস্রোতা এক নদী অরণ্য আর পাহাড়ের মধ্য দিয়ে নিচে নামতে নামতে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। স্বপ্নের মধ্যেই শুনতে পাই বৃক্ষছেদনের করাত আর কুঠারের শব্দ আর দেখি বনভূমির বড়ো বড়ো গাছ নিঃশব্দে মাটিতে শুয়ে পড়ছে।

সকালে কি চমৎকার রোদ উঠেছে। গেটের কাছে গিয়ে দেখি একটানা গাড়ির প্রবাহ। এখন অনেকটা চঞ্চল আর উচ্ছৃঙ্খল এই প্রবাহ। ট্যাঙ্ক আর ভ্যানগুলো সম্ভবত আগে চলে গেছে, এখন যাচ্ছে ছোটো গাড়ি। গতি অনেক বেড়েছে, পেছনের গাড়ি অতিষ্ঠ হয়ে রাস্তার কাঁচা অংশে নেমে সামনের গাড়ির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

সৈন্যদেরও চোখে পড়ছে। পরনে খাকি, হেলমেট কপাল পর্যন্ত নামানো, কোলে কাঁধে রাইফেল। যুদ্ধে অনভিজ্ঞ মানুষরা পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে। সৈন্যরা কাউকেই কিছু বলছে না। বেশিরভাগ গাড়ি সবুজ রঙের জাল কিংবা প্রচুর পরিমাণে গাছপালা দিয়ে ঢাকা। দেখতে দেখতে আবার আমার ক্লান্তি এলো। আমি কলেজের অফিসের দিকে গেলাম। কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে একজন অধ্যাপকের সঙ্গে ফিরে আসছি—বেলা তখন দশটা হবে—তিনটে বোমারু প্লেন পশ্চিম দিক থেকে তীব্র বেগে উড়ে এলো। এর আগে গত দু'একদিনে এক'আধটি প্লেন যে দেখা না গেছে, তা নয়। কেউ বলেছে পাকিস্তানি প্লেন, কেউ বলেছে চাইনিজ। যার যা খুশি। আজ প্লেন তিনটিকে দেখেই অন্যরকম মনে হলো। কাঁকড়া-বিছের মতো লেজ উঁচিয়ে কর্কশ শব্দে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার মুহূর্ত পরেই কানে এলো প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ। নিমেষটুকু মাত্র, চেয়ে দেখি, কলেজের ঠিক পুব গায়ে বিশাল তেলের ট্যাঙ্ক থেকে ঘন কালো, প্রায় নিরেট ধোঁয়ার একটি বিরাট থাম উঠে আসছে মাটি থেকে আকাশের দিকে আর প্লেনটা কাঠ-চেরাইয়ের কর্কশ আওয়াজ করতে করতে ফিরে যাচ্ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার অস্তিত্ব যেন বজ্র-বিদীর্ণ হয়ে দু'ভাগ হয়ে গেল। আমি এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারি না। মৃত্যুকে যেন হাত দিয়ে ছুঁতে পারছি। ঐ যে মুহূর্ত পরেই তেলের বিশাল ট্যাঙ্কটি চূর্ণ হয়ে আকাশে উড়ে যাবে আর বিশাল একটি আগুনের সমুদ্র আমাদের গ্রাস করে নেবে। খুব অল্প সময়ের জন্য ঢুকছি অকল্পনীয় তাপ, অকহতব্য যন্ত্রণা, চূর্ণ-বিচূর্ণ ছড়ানো অস্থি, পোড়া রক্তমাংসের গন্ধে ভরা একটি জগতে। একটি মুহূর্তের জন্যই মাত্র—কারণ সেই জগতের অংশ হয়ে যাওয়ার পরে তো শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তখনি আবার প্লেনের আওয়াজ পেলাম—সেই জোড়াই ফিরে এসেছে। একেবারে জন্তুর মতো ছুটে চলি। সামনেই অধ্যক্ষের বাড়ি—দুটি লাফে সিঁড়িগুলো টপকে বসার ঘরে ঢুকেছি মাত্র, আবার সেই দারুণ বিস্ফোরণের আওয়াজ পেলাম। ঘরের মধ্যে দেখি আর একজন অধ্যাপক—পাকিস্তান বাঁচানোর শখে টইটম্বুর ছিলেন—আমি

ঘরে ঢুকতেই শিশুর মতো চিৎকার করে কেঁদে উঠে প্রাণপণে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন আর কোরআনের বড়ো বড়ো আয়াত আওড়াতে থাকলেন। ওদিকে ঘরের আর এক কোণে এক প্রৌঢ়া একবার আমাকে আর একবার আমার সহকর্মীকে জড়িয়ে ধরে বলে যায়, ও বাবা, বাবারে, আমার লতিফ কনে গেল, ও বাবা, বাবারে, আমার লতিফ কনে রে, ও আল্লারে।

আমি নিশ্চিত যে কয়েকটি মুহূর্ত আমি কিছুই ভাবি নি, সম্পূর্ণ জন্তু হয়ে গিয়েছিলাম, একটি তাড়না ছাড়া আর কোনো কিছুই কাজ করে নি আমার মধ্যে। ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আর একবার যখন প্লেনের আওয়াজ পেলাম, তখন একেবারে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মনে পড়লো, বাসায় আমার দুটি কন্যা, স্ত্রী আর মা-বাবা আছেন। এই মুহূর্তটিও বর্ণনার বাইরে। প্লেন দুটি তখনো আকাশে চক্কর দিচ্ছে, যাচ্ছে আসছে। কিন্তু কথাটি মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের তাড়না আর লেশমাত্র অনুভব করি না। যেন পৃথিবীর নির্ভীকতম মানুষটি আমি দানবের আকৃতি পেয়ে গেছি। ঘরের দরজা খুলে আমি বাসার দিকে দৌড়াই। প্লেন দুটি একইভাবে আকাশে চক্কর দিচ্ছে। বাসায় পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিস্ফোরণ ঘটলো। আমার আজো স্পষ্ট মনে আছে, টকটকে লাল রঙের বিরাট একটি মোরগ বোমার প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য পা ভেঙে মাটিতে মুহূর্তের জন্য বসে পড়লো, তারপরেই উঠে দাঁড়িয়ে গর্বিত চমৎকার ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে মাটিতে দুতিনবার ঠোঁট ঘষে নিল। আমি বুঝতে পারি পশুপাখি কীভাবে জীবনকে নিতে হয় মানুষের চেয়ে তা ভালো জানে।

বাসার পাশে খোঁড়া ট্রেঞ্চে পরিবারের সবাই ইতিমধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। দেখলাম, শুধু আমার বাবা বিরক্তমুখে বাসার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন। তখন তাঁর বয়স তিরাশি বছর, শীর্ণ, ছোটখাটো সিধে মানুষটি। আমাকে দেখে বললেন, আমাকে কেন ঐ গর্তে ঢুকতে বলছো তোমরা? দরকারটা কী বলতে পারো? তুমি যাও, তাড়াতাড়ি ওখানে আশ্রয় নাও। আমি তাঁর কোনো কথায় কান না দিয়ে একটি হাত ধরে তাঁকে সাবধানে ট্রেঞ্চে নামিয়ে দিলাম, নিজেও লাফিয়ে নেমে

গেলাম। গোলাপের কুঁড়ির মতো ছোটো মেয়েটির মুখ, চার বছর বয়স, আমাদের ধমকে বৃথা কানে তুলো গোঁজার চেষ্টা করছে। এ সময় একটি প্লেন আবার ফিরে এলো। আমাদের মাথার উপরে পৌঁছেই ধাতব বোমাটি ত্যাগ করল। রোদের মধ্যে ঝকঝকে বোমাটিকে আমি দ্রুত নেমে আসতে দেখলাম। কান বন্ধ ছিল তুলো দিয়ে, আমি চোখ দুটিও বুজিয়ে ফেললাম। ভয়ানক শব্দে বোমা ফাটল—ট্রেঞ্চের মধ্যে একগাদা মাটি এসে পড়ল। বোমা পড়েছে নদীর ঠিক ওপারে—জুট বেলিংয়ের একটি গুদামে। শীতের ভৈরব নদী পেরিয়ে একটি স্প্লিন্টার এসে গেঁথে গেছে ট্রেঞ্চ কাটার সময় তোলা আলগা মাটিতে। ফাটা চেরা লোহার টুকরোটা তখনো এতো গরম যে হাত দেয়া গেল না। বোমা ফেলে প্লেনটা এবার সত্যিই চলে গেল।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি জনারণ্য। নারী-পুরুষ কেউ বাড়িতে নেই। সবাই এসে জমেছে রাস্তায়। পাকিস্তানি সৈন্যরা অবিশ্রান্ত এগিয়ে যাচ্ছে খুলনার দিকে। কোটরগত চোখ, তাড়া খাওয়া, ঘষা-লাগা, মাজা নেমে-যাওয়া কুকুর যেন— কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সামনে চোখ মেলে শূন্য দৃষ্টিতে হেঁটে যাচ্ছে। মানুষ শুধুই জটলা করছে—কী করা উচিত কেউ জানে না। আমি বাসায় ফিরে গেলাম এবং ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় সবাইকে নিয়ে চৌরাস্তার মাথায় এসে দাঁড়ালাম। জিনিশপত্র যা কিছু যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল, দুপুরের খাবার পর্যন্ত। এই যশোর রোডের উপরেই দৌলতপুর থেকে যশোরের দিকে নয় মাইল দূরে আমাদের গ্রামের বাড়ি। এই নিভৃত জায়গাটিকে আমার সমস্ত প্রাণ যেন আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইল। মনে হলো ওখানে পৌঁছুতে পারলেই আমরা পুরোপুরি নিরাপদ হতে পারি। চৌরাস্তার মোড়ে যাওয়ার পথে একটি পুরনো বাড়ির পেছনের ছায়ায় পাশাপাশি দশটি মানুষ শুয়ে রয়েছে। জুট বেলিং গুদামে যারা ছিল তাদের লাশ। আধঘণ্টা আগে এরা সবাই বেঁচে ছিল। বেশিরভাগ লাশই ছিন্নভিন্ন; ভাঙা, পোড়া, থেঁতলে যাওয়া, শরীরের অংশবিশেষ নিশ্চিহ্ন। কিন্তু কী অদ্ভুত শান্তি মিলেছে তাদের!

কয়েকটা রিকশা জোগাড় হলো কোনোমতে। পাকিস্তানি সৈন্যদের ভেতর দিয়ে তাদের রাইফেলের গুঁতো খেতে খেতে, তাদের ভিড়

সরাতে সরাতে উজানে চলতে শুরু করলো আমাদের রিকশা কটি। এরকম প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতা একমাত্র পরিমাপহীন অনভিজ্ঞতার ফলেই দেখানো সম্ভব হতে পারে। বর্বর কাপুরুষ পাকিস্তানি সৈন্যদের যে কেউ আমাদের মুহূর্তে হত্যা করতে পারতো। তা না করার কোনো কারণ তাদের ছিল না। রিকশায় বসে বসেই ওদের কখনো কখনো হাত দিয়ে সরাতে হচ্ছিল। তবে হতে পারে, মৃত মানুষেরা হাঁটছিল তখন, দম দেয়া পুতুলের মতো। বিপদটা বোধহয় এখানে ছিল না। বিপদ কোথায় তা সামান্য এগিয়েই আমি বুঝতে পারি।

বোমারু প্লেনগুলো বারবার ফিরে আসছে। ওদের এখন আর বুঝতে বাকি নেই যে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে বিমান আক্রমণের কামান-টামান কিছু নেই। কাজেই রাস্তার ওপর বোমা ফেলে তারা এই পুরো বাহিনীটিকে সহজেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। বিমানগুলো অনেক নিচে নেমে এসে রাস্তা বরাবর শূন্যে কড় কড় শব্দে চিরুনির মতো আঁচড়ে যাচ্ছে। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে তীব্র গতিতে রাস্তা ধরে একবার নিচের দিকে যাচ্ছে—আবার উঠে আসছে। ঘন ঘন ফিরে আসছে তারা। শব্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানিরা কাটা গাছের মতো রাস্তার পাশের ঢালুতে শুয়ে পড়ছে, মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে শরীর। আমরা ধীরেসুস্থে রিকশা থামাচ্ছি, তারপর রিকশা থেকে সকলকে নামিয়ে কোনো একটা বাড়ির বারান্দায় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছি, এর মধ্যে রাস্তা ধরে প্লেনগুলো দশবার যাতায়াত করে নিচ্ছে। আশ্চর্যের কথা এই : প্লেনগুলো একবারও বোমা ফেললো না কেন? শত্রুকে এর চেয়ে বাগে পাওয়া তো সম্ভব নয়! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে পুরো পাকিস্তানি বাহিনীই সেদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, তবে আমরাও যে কেউ বাঁচতে পারতাম না তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষ হাজারে হাজারে মারা পড়বে শুধু এই বিবেচনাতেই কি সেদিন প্লেনগুলো বোমা ফেলে নি? আমি জানি না কিন্তু অন্য কোনো কারণের কথা তো আমি ভেবে উঠতে পারি না।

এই ভয়াবহ যাত্রাও একসময় শেষ হয়ে গেল। আমাদের রিকশাগুলো যখন পাকা যশোর রোড থেকে ডাইনে ভেঙে আমাদের বাড়ির কাঁচা সড়ক ধরলো, তখন শুধু বাঁচার ধকলে আমার সর্বশরীর

অবশ হয়ে এলো। চেয়ে দেখি, আমার স্ত্রী তাঁর দুই কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—তাঁর দুই চোখ ফেটে গড়িয়ে নেমে এলো বড়ো বড়ো দু'ফোঁটা অশ্রু।

তিন কি চার মিনিটের মধ্যে আমরা বাড়িতে পৌঁছে যাই। আমাদের একটা পুরনো পাকা দালান বাড়ি আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। বিঘে চারেক জমিতে শুধু ছায়া। নারকেল সুপারি আম কাঁঠাল লিচু এলোমেলো ছড়ানো। একদিকে একটা অন্ধকার বাঁশঝাড়ের পাশে বিশাল এক তেঁতুলগাছ। আশশ্যাওড়া আর ভাটের জঙ্গলও আছে। মনে হলো দুর্ভেদ্য দুর্গে ঢুকে পড়া গেছে। লাল সিমেন্টের চওড়া বারান্দা প্রায় এক বুক উঁচু, সেগুন কাঠের ঝাঁঝরি ঝুলছে বারান্দার ছাদ থেকে। চুন-সুরকির পুরনো গন্ধ বাড়িতে, যেখানে-সেখানে পলেস্তরা খসা, দেড় হাত চওড়া দেয়ালে শ্যাওলা, ছাদে বিরাট ফাটল। মুহূর্তের মধ্যে বাড়িটা আমাদের ভেতরে টেনে লুকিয়ে ফেললো। বাড়িতে অন্য যারা ছিল আমাদের জড়িয়ে ধরে তারা কাঁদছে। কেবলই মনে হচ্ছে এখানে কীভাবে মরবে মানুষ? মৃত্যু অত সহজে পথ পাবে না। আবার কানে এলো প্লেনের মৃদু গুনগুনানির শব্দ। অনেক দূর থেকে আসছে। কিন্তু এবার আর এতটুকু আতঙ্ক এলো না মনে। দ্রুত পায়ে আমি একা যশোর রোডের দিকে ফিরে গেলাম। প্লেনের শব্দ এবার আর কানে এলো না। বাঁধানো বেদিটায় এসে বসি। কোথাও কোনো মানুষজন দেখা যাচ্ছে না। যখন মনে হতে শুরু করেছে এই স্তব্ধতা সহজে আর ভাঙবে না, ঠিক তখনি বাঁক ঘুরে এলো পনেরো-বিশজনের একটি পাকিস্তানি সৈন্যের দল। যশোর রোড ধরে খুলনার দিকে যাচ্ছে মাতালের মতো টলতে টলতে। তারা কাছাকাছি এলে দেখলাম, মাতালের মতো নয়, তারা যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটছে। অসম্ভব ক্লান্তিতে পা তুলতে পারছে না। অনেকেই আছে খালি পায়ে, বুটজুতো নিয়েছে হাতে। এক পায়ে মোজা আছে, অন্য পায়ে নেই। উর্দি খুলে ফেলেছে কেউ কেউ, বেল্ট নেমে গেছে কোমরের নিচে। অনেকের কাছেই রাইফেল নেই। কোনো দিকে খেয়াল না করে একজন আর একজনের গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছে। পিচঢালা রাস্তা থেকে ঘাসে নেমে রাস্তার ঢালুতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে

পড়তে আবার উঠে আসছে রাস্তায়। সম্ভবত এইটাই হলো মাথা থেঁতলানো গোখরোর ল্যাজের শেষ কম্পন। দলটা আর একটা বাঁক ঘুরে চোখের আড়াল হয়ে গেল। এই প্রথম মানুষের অসম্ভব দুরবস্থায় আমার মন ভিজলো না। আমি ভেবে দেখতে পর্যন্ত রাজি হলাম না। আমার ভেতরটা প্রচণ্ড রাগে রি রি করে জ্বলতে লাগলো। দলটা চলে গেলে আবার নিস্তব্ধতা নামলো। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। একটা শূন্য ভিটেয় খঞ্জনা লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। বাংলাদেশে এখনো তাহলে খঞ্জনা আছে? অবাক কাণ্ড, ডান হাতের হলুদ জঙ্গল থেকে একটা মেটে রঙের খরগোশ বড়ো বড়ো লাফ দিয়ে পাশের পুকুর পাড়ের ঝোপের মধ্যে চলে গেল।

স্তব্ধতাটা খুব ভারি মনে হতে লাগলো। আমি বাড়িতে ফিরে এলাম। এই অঞ্চলের পাকিস্তানি বাহিনীর সম্ভবত শেষ দলটি এইমাত্র চলে গেল। কিন্তু প্যান্ট ঝুলে-পড়া, জিভ-বেরোনো লোকগুলো কতোদূর যাবে?

ওরা এখান থেকে সাত-আট মাইল দূরের ছোটো ছোটো শহর-গঞ্জ আর আশপাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়বে। বড়োজোর পৌঁছুতে পারবে চৌদ্দ মাইল দূরে খুলনা শহরে। তারপর আর পথ নেই। বুনো-বাদা অঞ্চল দক্ষিণ, নদী আর খাল, জলা জঙ্গল। রূপসা পশুর বলেশ্বর এসব দক্ষিণের নদী। তাদের বিশাল বুক ফুলে ওঠে জোয়ারে। তারা সবাই মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি বড়ো অংশ কোণঠাসা হতে হতে এইবার ছড়িয়ে পড়বে খালে, বিলে, জলায়-জঙ্গলে। নোনা মাটির উপরে, নোনা পানিতে পড়ে থাকবে তাদের দেহ। আমি নির্জন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবতে থাকি আর গত নয়টি মাস চলন্ত ছবির মতো দ্রুত ভেসে যায় চোখের সামনে দিয়ে। হাজারে হাজারে বাংলাদেশের মানুষের দেহ এসব পাকিস্তানি সৈনিকের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। অসংখ্য নারীর দেহ গাছে গাছে ঝুলেছে। বিবস্ত্র পড়ে আছে মাটিতে। পানিতে ভাসছে তাদের দেহ। বেয়নেটের ঘায়ে যোনি, তলপেট ছিন্নভিন্ন, উদরে গুহার অন্ধকার। কাক শকুন চিল ঠুকরে নিয়েছে এসব নারীর কালো চোখের তারা। হৃৎপিণ্ড বের করে

নিজেদের পেট ভরিয়েছে। রাস্তা-পথঘাট সবই ঝাপসা দেখতে থাকি আমি। যতোবার চোখ মুছি, মুহূর্তে আবার চারদিক ঝাপসা হয়ে আসে। নির্জনতা অসহ্য ভারের মতো বুকের ওপর চেপে বসে। রোদে পিচের রাস্তা ঝলকাতে থাকে ইস্পাতের ফলার মতো। কাছের দূরের গাঁ-গুলো স্তব্ধতায় মোড়া। আমি নিজের হৃৎপিণ্ডের দুম দুম শব্দ শুনতে পাই। নির্জনতার ভার যতোই বাড়ে, ততোই জোরালো হতে থাকে এই শব্দ। আস্তে আস্তে আমি বাড়ির দিকে ফিরে যাই। পুরনো বাড়ি আমাদের। সমস্ত উত্তর দিকটায় নোনা ধরেছে। বড়ো বড়ো থামে ফাটল। ঘরের ভেতরে প্লাস্টার নেই এখানে-সেখানে। ছাদ ফাটিয়ে বেড়ে উঠেছে অশথের চারা। কার্নিশ থেকে ঝোলানো সেগুন কাঠের নকশা-কাটা খড়খড়িগুলোর রঙ বিবর্ণ। মাটি থেকে বুক পর্যন্ত উঁচু লাল রঙের বারান্দায় সাপের মতো আঁকাবাঁকা ফাটল। কিন্তু আমি জানি লোহার কড়ি বরগা দিয়ে বাঁধা এই বাড়ি সহজে ভেঙে পড়বে না। পাকিস্তানিরা দক্ষিণে সরে গেছে। এই এলাকা এখন মুক্ত। এই বাড়ি এখন আমাদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়।

দুপুর দুটোর পরে ভারতীয় প্রথম জিপটি দেখতে পাওয়া গেল। বিমান হামলা এখন অনেক কমে এসেছে। শব্দ পেলেই আমরা আমাদের দুর্ভেদ্য সিঁড়িঘরটায় গিয়ে ঢুকছি। খুব দ্রুত প্রথম জিপটি চলে যাওয়ার পরে জমাট স্তব্ধতা আস্তে আস্তে গলতে থাকে। দেখা দেয় ভারতীয় বাহিনীর যানবাহনের স্রোত। পাকিস্তানি বাহিনীর পিছু হটাকে প্রথম দিকে মনে হয়েছিল অন্তহীন। এদের এই পিছু ধাওয়াকেও কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হতে লাগলো অন্তহীন।

হিমশীতল মৃত্যুর ঝাপটা গত ক'দিন বারবার টের পেয়েছি। মৃত্যুর এই হাওয়া ধাতব। এর ছোঁয়াটি যে কেমন কিছুতেই তা বর্ণনা করা যায় না। দুপুরে খাওয়ার পরে মৃত্যুর কুঠরিতে কতোকাল আটকানো বাড়ির মানুষগুলো মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে। এই ঘুমটাকেও বর্ণনা করা যায় না। ঘুম যে মৃত্যুর সহোদর এমন চলতি কথাটা যে কতোদূর সত্যি প্রত্যেকটি ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে আমি তা বুঝতে পারি।

এই সময়ে কানে এলো ভারতীয় কামানের প্রথম গর্জন। দূর থেকে কামানের আওয়াজ শোনায় মেঘের গর্জনের মতো, তফাত করা

যায় না। কিন্তু এই আওয়াজটা শুনেই মনে হলো শীতের রোদ-ভরা বিকেলে গভীর নীল আকাশ থেকে যেন বজ্রপাত হয়েছে। কান-ফাটানো গম্ভীর 'বুম' আওয়াজটার পরেই তীব্র ধাতব শব্দ চাঁই। এই একটি শব্দেই বাড়ির সমস্ত লোক জেগে উঠলো। বোঝা গেল বেশ কাছেই এসে পড়েছে। ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর একটি অংশ। একই শব্দ দ্বিতীয়বার আসতেই বিবর্ণ হয়ে যায় সকলের মুখ। শব্দের এইরকম প্রচণ্ডতার সঙ্গে কারও পরিচয় নেই। এমনকি যে বাচ্চাগুলো বোমা পড়ার আওয়াজ শুনেছে, কামানের গর্জন দ্বিতীয়বার শোনার পর তাদেরও মুখ শুকিয়ে উঠলো। কাঁপতে লাগলো পুরনো বাড়ির মজবুত ভিত। আমাদের সন্দেহমাত্র রইলো না যে এই এলাকার ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, গাছপালাসহ সমস্ত জনপদ মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে প্রয়োজন হচ্ছে শুধু কামানগুলোর মুখ কয়েক ইঞ্চি নিচের দিকে নামিয়ে আনা। সেগুলো এখনো আকাশমুখো আছে। শব্দ ঘন ঘন আসতে থাকে। সারা বাড়ি কাঁপে। রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখে বসে থাকতে থাকতে আমরা দেখতে পাই, বাড়ির পশ্চিমদিকে বিশাল ঝাঁপানো তেঁতুলগাছটির সবচেয়ে উঁচু কয়েকটি মোটা ডাল ভেঙে মুহূর্তে গাছটির মাথা অর্ধেক হয়ে যায়। বুঝতে পারি কামানের মুখ দু'চার ইঞ্চি নিচে নেমেছে। আচমকা একটা ভয় আমাদের আঁকড়ে ধরে। কিছুতেই আর বাড়ির মধ্যে তিষ্ঠুতে পারি না। শত্রু যখন বহুদূরে, কোনো প্রতিরোধ নেই, তখন জনপদ ধ্বংস করার জন্য কেন নামবে কামানগুলোর মুখ তার হিশাব পাই না। পঁয়ষট্টি সালে বাংলাদেশে সত্যিই কোনো যুদ্ধ হয় নি। একমাত্র চোখের সামনে না ঘটা পর্যন্ত যুদ্ধ ঠিক কী ব্যাপার তা বোঝার কোনো রাস্তা নেই। বাড়ির দরজা-জানালা হাট করে খোলা থাকলো, যেখানকার জিনিশ পড়ে থাকলো ঠিক সেখানেই, দু'এক মিনিটের মধ্যে বাড়ির সমস্ত লোকজন নিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। লম্বা একটা মিছিল। সব মিলিয়ে বিশজন হবে। সঙ্গে আছেন সপরিবারে আমার এক সহকর্মী। বড়োরা সামনে, পেছনে শিশুরা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা সুঁড়িপথ ধরে এগিয়ে চলেছি নদীর দিকে। এদিকে যুদ্ধ শুরু হলে নদী পেরিয়ে ওপারের কোনো গ্রামে আশ্রয় নেব। কোথায় তা জানি না। কামানগুলোর প্রচণ্ড

আওয়াজে পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। নিজেদের কি ছোটো, কি অসহায় যে মনে হচ্ছে বর্ণনা করা যায় না। মাঝে মাঝে গোলার আঘাতে বড়ো বড়ো গাছের ডাল ভেঙে নিচে পড়ছে। তার দু'একটি ঘাড়ে পড়লেই নিশ্চিত মৃত্যু। যুদ্ধের মধ্যে মৃত্যু এত সহজ। একটি মাত্র গোলার ঘায়ে এই পুরো বিশজন মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। এই মুহূর্তে বেঁচে আছি, এখনি মরে যেতে পারি— একেবারে অচেনা একটা অনুভূতি। এই অনুভূতির সঙ্গে এর আগে কোনোদিন পরিচয় হয় নি। বলতে ভুলেছি, বাবা কিছুতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন না। তখন তাঁর বয়স তিরাশি পেরিয়েছে। তিনি শুধু জানালেন, 'আমি যাচ্ছি না, তোমরা যাও। তোমাদের যাওয়াই উচিত মনে হচ্ছে।' কিন্তু তাঁর কেন যাওয়া উচিত নয় এই প্রশ্ন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে করতে সাহস পেলাম না।

যখন নদীর পাড়ে এসে পৌছুলাম, তখন ডিসেম্বরের উজ্জ্বল দিনের শেষ রোদটুকুও মিলিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত লাল রঙ সেই রোদের। গাছগুলোর মাথায় ঝিকমিক করছে। উপরে আকাশে যে তখনো বেশ আলো আছে তা বোঝা গেল। চারটি প্লেন উড়ে আসতেই দেখতে পেলাম তাদের ধাতব গা থেকে রোদ ঝলকাচ্ছে। চারটি প্লেন। একেবারে গায়ে গায়ে উড়ে এসেছে। আমি চেয়ে আছি ওগুলোর দিকে। পাকিস্তানি সৈন্যের নাম-নিশানা নেই কোথাও। প্লেনগুলোর কাজ কি এদিকে এখন? আমি এই কথা ভাবছি আর প্লেনগুলোর দিকে চেয়ে আছি। হঠাৎ সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে প্রচণ্ড শব্দে প্লেনগুলো বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ শুরু করলো। বোমা নয়, প্লেন থেকে বোমা পড়া আমি নিজের চোখে দেখছি। চারটি প্লেন এক সঙ্গে স্ট্রেফিং শুরু করেছে। তার তীব্রতা চেয়ে দেখাও প্রায় অসম্ভব। শাদা প্লেনগুলোর সামনে থেকে, মুখ দিয়েই বলবো, ধবধবে পারদের মতো শাদা থুথু অকল্পনীয় তীব্র গতিতে নিচের দিকে ছিটকে পড়ছে। আমার মনে হতে লাগলো নিয়তির মতো অমোঘ এই আক্রমণ। কিন্তু লক্ষ্য কি এই আক্রমণের? চেয়ে তো দেখছি আক্রমণ প্রায় আমাদের মাথার উপরেই চলছে। সঙ্গের লোকজন খুব তাড়াতাড়ি নদীর একেবারে তীরঘেঁষা একটি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিল। বাড়ির মালিক আমার চেনা, নাম

সরু মিয়া। তবে অত জবরদস্ত মোটাসোটা মানুষ বাঙালিদের মধ্যে আমি কমই দেখেছি। কিন্তু চেহারাটা তাঁর সম্পর্কে ভুল ধারণা দেয়। অতি অমায়িক মানুষ তিনি। সবাইকে বাড়ির একেবারে ভেতরের কামরায় নিয়ে গেলেন। চারটি প্লেনের স্ট্রেফিং কিন্তু সমানে চলছে। কাকে আক্রমণ কিছুতেই এই হিশেব মেলাতে না পেরে আমি নিজে তখন তীব্র ভয়, অসহনীয় উদ্বেগ আর অদম্য কৌতূহলের চাপে পুরোপুরি বিপর্যস্ত। সবাইকে ভেতরে রেখে কারো কথা না শুনে আমি ছুটে বেরিয়ে আসি বাড়ি থেকে। প্লেন চারটি তখনো সমানে চোখ ধাঁধানো শাদা থুথু ছিটোচ্ছে।

এক সময় ক্ষান্ত হলো তারা। ওগুলো চলে যেতেই দারুণ উদ্বেগে ঠাসা একটা নিঝুমতা নেমে এলো চারদিকে। সরু মিয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নদীর পাড় থেকে নেমে ঠাণ্ডা পানি ছুঁয়ে দাঁড়াই আমরা। সূর্য ডুবে গেছে। নদীর উপর ছাই রঙের অন্ধকার একটা চাদর খুব তাড়াতাড়ি ঘন সুরমা রঙ ধরছে। শীতের সন্ধ্যা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। নদীর ওপারে গ্রামটির নিবিড় কালো উঁচু-নিচু রেখা দেখা যাচ্ছে। আশপাশে কোথাও মানুষের চিহ্ন নেই। অন্ধকারের মধ্যে নদীর পানি ছলাৎ ছলাৎ শব্দে তীরে এসে আঘাত করছে। সেই শব্দ শুনছি আর একটা গম্ভীর পূর্ণতার অনুভব হচ্ছে। জোয়ারে নদী ফুলছে। আকাশে ঝকঝকে তারা দেখা দিল। খুব ঠাণ্ডা একটা বাতাস উঠলে চারপাশ থেকে শুকনো পাতার খড়মড় আওয়াজ আর নানারকম দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কানে এলো।

পাকিস্তানি বাহিনী পুরোপুরি সরে গেছে যে এলাকা থেকে সেখানে এসে কারা গুলিবর্ষণ করলো? তবে কি যুদ্ধের মোড় হঠাৎ ফিরে গেছে? পাকিস্তানের মিত্ররা এসে হাজির হয়েছে? মার্কিন সপ্তম নৌবহরের গুজব তো কয়েকদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিকমতো জানতে না পারলে বাড়িতে ফিরে যাওয়া কি উচিত হবে?

ভাবছি, এই সময় অন্ধকারের মধ্যে আর এক পোঁচ বেশি কালো, আলকাতরা মাখানো একটি নৌকো নিঃশব্দে আমাদের পায়ের কাছে এসে ভিড়লো। কাদায় নৌকো আটকে যাওয়ার খস্-স্ শব্দটা পর্যন্ত শুনতে পেলাম। কোনো কথা না বলে একে একে আমরা সবাই

নৌকোয় উঠলাম। মা ভারী মানুষ, বয়সও হয়েছে অনেকটা। তাঁকে একরকম ধরাধরি করেই উঠানো হলো। আমার ছয় আর চার বছরের কন্যা দুটি আঁকড়ে ধরে আছে তাদের মায়ের হাত। সামান্য ঢেউ-ওঠা অন্ধকার নদী যখন পার হচ্ছিলাম, কারো মুখে কোনো কথা নেই। মনে হলো আমরা স্টাইক্স পার হয়ে মৃতের জগতে যাচ্ছি। নীরব একা বুড়ো মাঝিটি যেন চেরন।

ওপারে এসে নামতে আবার সেই ঘন কালো উঁচু-নিচু গ্রামরেখা। নদীর পাড়ে উঠে জঙ্গলের সুঁড়িপথ। কোথায় যাবো কিছুই স্থির নেই। একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে আবার লম্বা মিছিল করে চলেছি। গ্রামটা এখন যতোই অপরিচিত লাগুক, আগে এসেছি তো এখানে। আমি জানি ঘাটের উঁচু পথটা ধরে খানিকটা এগোলেই একটা ভাঙা ঘর। সেটা পোস্ট অফিস। তারপর আছে বিরাট একটি দালানবাড়ি। একদিন সেটা রাজপ্রাসাদ হিশেবেই তৈরি হয়েছিল। এখন ইটের পাঁজা মাত্র। আগাগোড়া জঙ্গলে ভরা। কাঁটাগাছ ভাট আর আশশ্যাওড়ায় দুর্ভেদ্য। আমরা অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজে এই বাড়িটায় ঢুকলাম। ভেতরের দিকে যে ঘরটায় ঢুকেছি সেটা ছাদহীন, প্লাস্টারের নামগন্ধ নেই। সমস্ত ইট দাঁত বের করে আছে। এই শীতে সাপের ভয় নেই। জঙ্গল ঠেলে ঘরে ঢুকে সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। মনের মধ্যে হঠাৎ আসে নির্বেদ। আর কিছুই করার নেই। কারো সঙ্গে কিছুমাত্র যোগ অনুভব করছি না। খানিক পরে দেখা গেল একটি হারিকেনের লাল আলো এদিকে আসছে। এপারে আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এই প্রথম আলো। মানুষের প্রথম চিহ্ন। হারিকেন হাতে জঙ্গল সরিয়ে যে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তাকে আমি চিনি। কেবল কৈশোর পেরিয়েছে সে। মুখ এখনো বালকের। ওর নাম মিখাইল। এই নামটা সাধারণত কানে আসে না। মিখাইল মানুষটা হালকা-পাতলা, ছোটখাটো, দেখেই মনে হয় বালকের মুখটা বেশ কিছুকাল থাকবে ওর। এখনো কোনো কোনো বাঙালি ছেলের মুখ আমার কাছে সেইন্টের মতো মনে হয়। কেন মনে হয় জানি না। প্রথমবারের মতো হালকা দাড়ি-ওঠা মিখাইলের মুখটাও আমার তেমন লাগে। সে হাতের হারিকেনটা আমার মুখের দিকে তুলে ধরে বলে,

'স্যার এ বাড়িটা তো আর বাড়ি নেই, জঙ্গল আর সাপখোপে ভরা। একটা ঘরেরও ছাদ নেই। আপনি আমাদের বাড়িতে আসুন।' মিখাইলকে আমি চিনতাম এই পর্যন্ত। তার শিক্ষক নই আমি। কখনো তার কোনো কাজে এসেছি বলে মনে পড়ে না। নতুন করে যুদ্ধ যদি শুরু হয়, তা সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। তাদের নিজেদের বাড়িঘরেরই চিহ্ন থাকবে না। সে আমাদের ডাকছে কেন?

আমি বললাম, 'তোমাদের বাড়ি কতোদূর এখান থেকে? সেখানে গিয়ে লাভই-বা কী?' মিখাইলের হারিকেন ধরা হাত তেমনিই তোলা, মুখে একই রকম বিষণ্ন হাসি। সে বললো, 'এখানে তো বসার জায়গাটা পর্যন্ত নেই স্যার। আমাদের বাড়িও একেবারে ভাঙাচোরা, আপনাকে এই অবস্থায় না দেখলে আমাদের বাড়ি যেতে বলার সাহসই পেতাম না। আমাদের বাড়ি গেলেই সেটা বুঝতে পারবেন। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। চলুন।'

মিখাইলের পিছু পিছু আরো সরু একটা সুঁড়িপথ ধরে গাঁয়ের ভেতরের দিকে ঢুকি আমরা। বাচ্চারা মায়েদের কোলে, আর তাদের জেগে থাকার ক্ষমতা নেই। আমার মা হঠাৎ চলৎশক্তি হারালেন। মিখাইল আর আমার এক ভাই তাঁকে এক রকম ঘাড়ে তুলে নিল। বেশি দূরে নয় ওদের বাড়ি। তবু মনে হচ্ছে এ পথটুকু আর শেষ হবে না। রাস্তার দু'পাশের গাছের ডালপালা লতা চাবুকের মতো এসে আঘাত করছে। শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছুলাম চারদিক সম্পূর্ণ খোলা একটি উঠোনে। উঠোনের মধ্যে এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে আছে বড়ো বড়ো উনুন। ধান সেদ্ধর গন্ধ নাকে এলো। একপাশে একটা পুরনো একতলা পাকা বাড়ি। মিখাইল এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। দরজা খুলে দিয়েই সরে গেল গা-মাথা ঢাকা মেয়ে। আমরা বিশজন মানুষ সেই ঘরে ঢুকলাম। মিখাইলের হারিকেনের আলোয় দেখতে পেলাম ঘরের লাল রঙের মেঝের আড়াআড়ি এক ইঞ্চি চওড়া একটা ফাটল—ফাটলের এদিকের মেঝে ওদিকের মেঝের থেকে অন্তত ইঞ্চি দেড়েক নিচু। সন্ত্রস্ত হয়ে উপরের দিকে চেয়ে দেখি ছাদেও ঠিক একই রকম ফাটল। তার মানে ঘরটার ঠিক আধাআধি ভিত নিচে বসে গেছে। এই বাড়িতে বাস করে মিখাইল। আর কে কে এ-বাড়িতে

আছে জানি না। আবছা দেখতে পেলাম দ্রুত হাতে ঘরের জিনিশগুলো কারা যেন বাইরে বারান্দায় বের করে নিয়ে গেল। বারান্দা থেকে মোটা ভারি রাগত গলায় আদেশ ভেসে এলো, 'ঘরে যারা শুয়েছিলি বিছানাপত্র বার করে বারান্দায় রাখ, চ্যাটাইগুলো পেতে দে তক্তাপোশের উফর। তারপর কি হবেনে মিখাইল? বোধ বুদ্ধি কিছু আছে তোর?' হারিকেন নামিয়ে রেখে মিখাইল বারান্দায় গিয়ে নিচু গলায় কিছু কথা বললো। ভারি অসন্তুষ্ট গলা ভেসে এলো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, 'সে তো বোঝলাম।' তারপর আর কোনো কথা নেই। ঘরের মেঝের নিচের দিকটায় বিরাট একটা ছাপ্পর খাট পাতা। তার ওপর কে যে কখন চাটাই পেতে দিয়ে গেল টেরই পেলাম না। ছাদটা যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে ভেবে আমি শিউরে উঠি। মধ্যবিত্তের স্বভাব এমনিই বটে। একটু আগে দাঁড়িয়েছিলাম ছেলেমেয়ে নিয়ে ছাদহীন অন্ধকার ঘরে আগাছা আর জঙ্গলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে। আর এখন একটা ঘরে ঢুকতে পেরে প্রথমেই ভাবছি ছাদটা যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। অথচ ঠিক এই ঘরটিতেই দিনের পর দিন বাস করছে মিখাইলের বাড়ির লোকেরা, যারা আমাদের সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে ঘরটা ছেড়ে দিয়ে নিজেরা বারান্দায় চলে গেছে।

আমাদের কারো মুখ থেকে একটি শব্দ বের হলো না। ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তায় সমস্ত বোধ লোপ পেয়ে গেছে। বাচ্চাগুলোকে কাঠের টুকরোর মতো ছুড়ে দেয়া হলো খাটের চাটাইয়ের ওপর। বাচ্চাদের কেউ নড়লো না। তাদের মা-রাও প্রথমে বসলো, তারপর ঘাড়-মাথা গুঁজে সেখানেই বাচ্চাদের পাশে শুয়ে পড়লো। মনে হলো ওদের কারো দেহে প্রাণ নেই। আমার সহকর্মী একপাশে খাট থেকে পা ঝুলিয়ে বসে ঝিমুতে লাগলেন। ছাপ্পর খাটটা কি দরকারমতো বড়ো হতে জানে? আশ্চর্য হয়ে দেখলাম আমাদের বিশজনের সবাই কী করে শুয়ে-বসে ওখানে জায়গা করে নিয়েছে। মেঝেতেও একটা ছেঁড়া মাদুর পাতা হয়েছে।

রাত বাড়তে থাকে। মিখাইল একবারও এদিকে আসে না। বারান্দার সেই ভারি গলার লোকটির নাকঝাড়ার আওয়াজ পাই মাঝে

মাঝে আর টের পাই বাড়ির লোকজনের সন্তর্পণে অথচ দ্রুত চলাফেরার শব্দ। মনে হচ্ছে আমাদের এইভাবে নিয়ে আসাতে মিখাইলের বাবা ক্রুদ্ধ হয়েছে। লজ্জায় মিখাইল এঘরে আসতে পারছে না। বাড়ির পরিবেশে কেমন একটা থমথমে ভাব। রাতে খাবার জোটার কোনো সম্ভাবনা নেই। তার দরকারও নেই। ওদের এই ঘুমটুকুই স্বর্গপ্রাপ্তির মতো মূল্যবান।

এর মধ্যেই কামানের গর্জনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সমস্ত শব্দ যখন স্তব্ধতার মধ্যে ডুবে হারিয়ে গেছে, তখন আমি হঠাৎ সচেতন হয়ে খেয়াল করি কামানের গর্জন বেড়ে চলেছে। তার মানে হচ্ছে, যে একটি মাত্র কামানের গর্জন সইতে না পেরে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি, এতক্ষণের তীব্র উত্তেজনায় আমরা বুঝতেই পারি নি এই এলাকায় তাদের সংখ্যা এর মধ্যেই কতো বেড়েছে। চারদিক থেকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে কানে তালা ধরে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। শব্দ শুনেই বুঝতে পারছি ভারতীয় বাহিনীর সামনের দিকটা এখন এই এলাকা ছাড়িয়ে অনেকটা দক্ষিণে চলে গেছে। অনেকটা দক্ষিণে মানে কতোটা? খুলনা তো মাত্র চৌদ্দ মাইল দূরে। পাকিস্তানি বাহিনীর পিছু হটার শেষ হতেই হবে খুলনায়। তারপরে কী ঘটবে? শেষবারের মতো তারা কি একবার ঘুরে মুখোমুখি দাঁড়াবে না? মরিয়া চূড়ান্ত একটা সংঘর্ষ কি তাহলে আসন্ন? সেটা যদি ঘটে তাহলে এই তেরো-চৌদ্দ মাইলের মধ্যেই কোনো একটা জায়গায় ঘটবে।

বসে বসে আমি এসব আকাশ-পাতাল ভাবছি, বিকট বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় সমস্ত অঞ্চলটা থরথর করে কাঁপছে, আকাশে আগুনের গোলা ছোটাছুটি করছে। মনে হচ্ছে কোথাও পাকিস্তানি বাহিনী শেষবারের মতো ফিরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ঘরের শান্তি একটুও বিঘ্নিত হচ্ছে না। বিরাট খাটটির উপরে নানা ভঙ্গিতে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে সবাই। কেউ শুয়ে, কেউ হেলান দিয়ে, কেউ ঘাড় গুঁজে। কান ফাটানো বিস্ফোরণের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে এতটুকু প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না কারো মধ্যে। মানুষের স্নায়ুর সহনক্ষমতার সত্যিই কোনো সীমা নেই।

আমার সহকর্মীকে জাগিয়ে দু'একটি কথা বলতে ইচ্ছে হলো। বারুদের গন্ধভরা হু-হু হাওয়া, শীতরাতের টলটলে অন্ধকারের মধ্যে তারাদের অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আর আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর বিরামহীন গর্জনে আটকানো স্তব্ধতার ভেঙে যাওয়া, ছড়িয়ে যাওয়া খণ্ডগুলো আর আমি সইতে পারছি না। কারো সঙ্গে কথা আমাকে বলতেই হবে। সহকর্মীকে জাগাতে যাচ্ছি এই সময় হুল্লোড় করে ঘরে ঢুকলো কয়েকটি ছেলে। আমার দুই ভাইও আছে ওদের সঙ্গে। ওরা হাসছে, চেঁচাচ্ছে, দু'একজন কাঁদছেও। একটা বিস্ময়কর মর্মান্তিক খবর শুনলাম ওদের কাছে। সন্ধের মুখে চারটি বিমানের যে প্রচণ্ড নাছোড় স্ট্রেফিং হয়েছিল সেটা ঘটে বাজারের মধ্যে। ভারতীয় বাহিনীর বিমানই এই কাণ্ড ঘটায়। বাজারের ভেতরে এখন বিশজনের ছিন্নভিন্ন লাশ পড়ে আছে। এখানে যারা এসেছে তাদের কারো কারো নিকট-আত্মীয়ও রয়েছে এই বিশজনের মধ্যে। কেউ সরায় নি তাদের। খবর শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কী করে ভারতীয় বিমান ঘটাতে পারে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড? বেলা এগারোটার আগেই প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে শেষ পাকিস্তানি সৈনিকটি। মুক্ত এলাকায় সাধারণ নিরীহ মানুষের ওপর কী ভয়াবহ আক্রোশের সঙ্গে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে তা তো নিজের চোখেই দেখেছি আমি। প্রশ্ন করতে একটা অবিশ্বাস্য জবাব পাওয়া গেল। পাকিস্তানি বাহিনী খুলনা পর্যন্ত যায় নি। তারা জড়ো হয়েছে এখান থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে শিরোমণি এলাকায়। দৌলতপুর শিরোমণির বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে তারা আর সেখান থেকেই শেষ প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিরোমণির কাছেই আছে ফুলবাড়ী বলে একটি জায়গা। পাকিস্তানি বাহিনীর জমায়েতটি এখানেই সবচেয়ে ঘন। নির্দেশ গেছে ফুলবাড়ীর ওপর হামলা চালানোর। আমরা আছি ফুলতলায়। ফুলতলা থেকে ফুলবাড়ীর দূরত্ব মাইল ছয়-সাতের বেশি হবে না। ফুলতলাকেই ফুলবাড়ী ধরে নিয়ে হামলা হয়েছে ফুলতলা বাজারে। পাকিস্তানি সৈন্যের ভয়ে গত কয়েকদিন ধরে আটকা থেকে ওদের পিছু হটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যারা বাড়ি থেকে বের হয় নি, সমস্ত পাকিস্তানি সৈন্য চলে যাওয়ার পরে ভারতীয় বাহিনীর বিমান দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যখন

তারা মুক্তির আনন্দে প্লেনগুলোর দিকে দু'হাত তুলে উন্মত্তের মতো নৃত্য শুরু করেছে, তখনি বজ্রের মতো তাদের উপরে নেমে এসেছে মৃত্যু। বজ্রাঘাতে মৃত্যুর মতোই বটে, মুহূর্তের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে ওদের শরীর। যে প্রচণ্ড চমক আর বিস্ময় আছে ভারতীয় বিমানবাহিনীর অশনিসম্পাতে তার কিছুই কি বোধের মধ্যে আনতে পেরেছিল এরা? শোনা গেল বাজারের মধ্যে যাদের দেহ পড়ে আছে তাদের আলাদা করে চেনার কোনো উপায় নেই। খণ্ড-বিখণ্ড মানবদেহ ছড়িয়ে আছে অনেকটা জায়গাজুড়ে। হাত পা মাথা জোড়া দিয়ে একটাও পুরো চেনা মানুষ তৈরি করা যাচ্ছে না। এই বিবরণ শুনতে শুনতে আমি শেষে অতিষ্ঠ হয়ে প্রশ্ন করি, 'কী করে জানা গেল এসব কথা?' তখন শুনলাম ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ফিরে এসেছে। পিঠে গামছা দিয়ে বাঁধা রাইফেল নিয়ে যাকে পাচ্ছে তাকেই জড়িয়ে ধরছে তারা। যেসব ছেলেকে পাকিস্তানি আর্মি ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে বলে ধারণা করা হয়েছিল, তাদের অনেকে যোগ দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। তারা এখন ফিরে আসছে।

ওদের কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হলো প্রচণ্ড দ্বিমুখী টানে আমার স্নায়ুতন্ত্র ছিঁড়ে যাবে। আমার নিজের ভেতরে আর কখনো সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি অনুভব এমন মুখোমুখি দাঁড়ায় নি। যুদ্ধ সরে গেছে দূরে। অন্তত এই মুহূর্তে এখানে কোনো যুদ্ধ নেই। বিকেলে যা ঘটেছে তা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। আমরা বেঁচে আছি, মৃত্যু আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেছে—এই অসহ্য আনন্দ আমার দুশ্চিন্তা দুর্ভোগ উদ্বেগ লাঞ্ছিত ভেঙে-পড়া শরীরটার মধ্যে ধরে রাখার শক্তি নেই। আর একদিকে সেই শেষ বিকেলের দুঃস্বপ্ন! মৃত্যু সরে গিয়েই আবার ফিরে এসে চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে গেল বিশটি মানুষের প্রাণ। একদিক থেকে তারাও মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু কতো তফাত। আমাদের মতো তারা পেল না মুক্তির অসহনীয় আনন্দের স্বাদ। মৃত্যুর মুক্তি কে চায়? বেঁচে থাকার এমন তীব্র আনন্দ পাওয়ার জন্য লক্ষবার দাঁড়ানো যায় মৃত্যুর সামনে। আমি এই মুহূর্তে কিছুতেই বাঁচার আনন্দ আর তার জন্য দেয়া এই নিদারুণ মূল্য মিলিয়ে নিতে পারছি না।

ঘরের মধ্যে আনন্দের হুল্লোড় বইছে। যে দু'একজনের আত্মীয়, ভাই বা মামা পড়ে আছে ফুলতলার মিথ্যা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদেরও মুখে ফুটেছে হাসি। ঘরের সকলেই উঠে বসেছে। মুখ থেকে সরে গেছে আতঙ্ক। ক্লান্তির ছাপ মুছে গেছে, জ্বলজ্বল করছে চোখ। সবাই এক সঙ্গে কথা বলছে। কেউ শুনছে না কারো কথা।

মিখাইলের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। একবারও সে আসে নি এদিকে। খেতে দিতে পারবে না বলে ছেলেটা কি লজ্জায় বাড়ি থেকে পালালো নাকি? আজ তো আমাদের খাবারের দরকার নেই। তাছাড়া এক্ষুণি ফিরে যেতে পারি নদী পেরিয়ে নিজেদের বাড়ি। চেনা নদী পার করে দেবে চেনা মাঝি। সকলকে নিয়ে বাড়িতে এখুনি ফিরে যাবো কিনা ভাবছি, মিখাইল এসে ঘরে ঢুকলো, তার হাতে পেতলের একটা বিরাট পানির জগ। জগটা মেঝেয় পাতা ছেঁড়া মাদুরের একপাশে রেখে সে আবার বেরিয়ে গেল। একটু পরে ফিরলো একগোছা টিনের বাসন হাতে। আমি তখন রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী ভদ্রলোক হয়ে উঠেছি। সবকিছু ফিরে এসেছে আমার মধ্যে। আমাদের সুবিধা নেয়া, আমাদের ভদ্রতা, আমাদের বিব্রত ভাব, অপরকে কষ্ট দেয়ার জন্য চাপা সঙ্কোচ—সবই ফিরে এসেছে। আমি বললাম, 'ও কি করছো মিখাইল। খবর তো সব শুনেছ। আমরা এখনি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।' আমার কথার উত্তরে মিখাইল শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো তার সেই বালকের দৃষ্টিতে। হারিকেনের আলোয় ওর চোখ দুটি দেখালো ভেজা। মুখে ধোঁয়ার মতো প্রথম দাড়িগোঁফ, শীর্ণ দুটি গাল। একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সে আমার দিকে। মনে হলো জীবনে আর কখনো এমন ইতরতার পরিচয় আমি দিই নি। এইটুকু একটা ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে কি ছোটোই না লাগলো আমার। শেষে আমিই কথা বলি, 'যাও মিখাইল, আমাদের জন্য তোমার মা-বোনেরা যা রেঁধেছেন নিয়ে এসো।' এ কথারও কোনো জবাব দিল না সে, মুখে শুধু ফুটে উঠলো একটা হাসি আর মুহূর্তের মধ্যে বেড়ে গেল তার ক্ষিপ্রতা। খুব তাড়াতাড়ি ঘরে এসে পৌঁছুলো বিরাট গামলায় চুরচুর ভর্তি করা ধোঁয়া-ওঠা গরম লাল ভাত—বাটিতে তরকারি আর অন্য একটি গামলায় চেরা কাঁচামরিচে

ভর্তি এ অঞ্চলের বিখ্যাত ডাল। আমরা খেতে বসে গেলাম। খেতে বসেই টের পাওয়া গেল পেটে রাক্ষুসে খিদে এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল। অমৃতের স্বাদ কাকে বলে জানি না, কোনো হিশেবেই আর কখনো জানার সম্ভাবনা দেখছি না, তবে মিখাইলদের বাড়িতে সেদিন অমৃতের স্বাদ পেয়েছি এই বিশ্বাস আমার আজো আছে। প্রায় কিছুই ছিল না খাবার, কাঁচকলার একটা হালকা ঝোল আর ডাল। খাচ্ছি, এই সময় শুনতে পেলাম সেই গম্ভীর রাগত কণ্ঠস্বর। মিখাইলের বাবা এখন একটু এগিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাইরের বারান্দা থেকে তাঁর কথা কানে এলো, 'এসব খাবার আপনারা খেতি পারেন না তা আমি জানি। যুদ্ধ চলতিছে, কাঁচকলার কাঁধিটে ভাগ্যিস বিক্রি হয়ে যায় নি, তাহলে শুধু ডাল দিয়েই খেতে হতো আপনাদের। কি খাতি দিছি, ভাবতে গেলেই শরম পাই, কিন্তু আমরা আর করবানে কি?'

একেবারে নেহাত বেহায়া না হলে ওঁর কথার জবাবে একটি কথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেজন্য আমি অন্য কথা বললাম, 'বিকেলের ঘটনার কথা শুনলেন তো? পাকিস্তানিরা এ এলাকা থেকে সরে গিয়ে শিরোমণিতে ঘাঁটি গেড়েছে। একেবারে বিনা যুদ্ধে ওরা বোধহয় হার মানবে না?' মিখাইলের বাবা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'যারা মারা গিইছে, তাদের তিন-চারজন আমার বয়েসি ছিল। মরণ এলে আর কি করা? যুদ্ধুর সময় মনে হয় এমন ঘটনা ঘটতি পারে। কি আর করা!'

'যুদ্ধটা কিন্তু এখনো শেষ হলো না?' আমি বললাম।

'কাল পরশুর মধ্যি শ্যাষ হয়ে যাবানে দ্যাখবেন।'

জীবনকে কীভাবে নিতে হবে তার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে কাউকে কাউকে দেখলে মনে হয়, জীবনকে কতোভাবে গ্রহণ করা চলে তা শেখারও কোনো শেষ নেই। মিখাইলের বাবাকে আমি সে রাতে দেখতে পাই নি, দেখেছিলাম পরের দিন, তার পরে অনেকবার। আমার মনে হয়েছিল, চমৎকার! জীবনকে এভাবেও নেয়া চলে। মানুষের মর্যাদা থেকে মানুষকে যে কোনো অবস্থাতেই নড়াতে পারা যায় না—দারিদ্র্য দিয়ে নয়, লাঞ্ছনা দিয়ে নয়, মৃত্যুভয় দিয়ে নয়; জীবনের সঙ্গেই তার একটা মূল উপাদান হিশেবে সংগ্রাম নামে যে জিনিশটা

মিশে আছে সেটাকে যদি বাঁচার অঙ্গ করে নেয়া যেতে পারে, তাহলে কিছুতেই মানুষের পরাজয় নেই—এই কথাটা আমার মনে হয়েছিল মিখাইলের বাবার সঙ্গে কথা বলে। জিনিশটা তিনি আমাকে সরাসরি জানাতে পেরেছিলেন এ বিষয়ে একটিও কথা না বলে।

খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে আবার হুল্লোড় চলতে থাকে। এবার মিখাইলও ঘরের এক কোণে এসে বসে চুপ করে। গত দু'তিন ঘণ্টা বিশজন মানুষের খাবার তৈরির জন্য যাঁরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন, মিখাইলের মা-বোনেরা, তাঁরাও এসে দু'চারটি কথা বলেন মেয়েদের সঙ্গে।

রাত যতো বাড়তে থাকে, কথা কমে আসে। হারিকেনটা বোধহয় এইবার জবাব দেবে। সমস্ত কাচটা ধোঁয়ায় কালো, তার মধ্যে জ্বলছে লাল একটুখানি আলো। কিছুক্ষণের মধ্যে পরম নিশ্চিন্তমনে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি ঘরের বাইরে এসে দক্ষিণ দিকে মুখ করে আকাশের নিচে এসে দাঁড়াই। দক্ষিণ দিকটা আলো হয়ে উঠেছে। মেলার আকাশে হাউইবাজির খেলা জমে উঠলে যেমন দেখতে হয়, নিরাপদ দূরত্ব থেকে ঠিক তেমনিই লাগছে ওদিকের আকাশটা। লাল-নীল আলোয় চোখ ধেঁধে যাচ্ছে। ফুলকির মতো ঝরে পড়ছে আলোর কণা। আগুনের বড়ো বড়ো গোলা তীব্র বেগে ছুটে যাচ্ছে আকাশ পেরিয়ে। রাতের যুদ্ধের আকাশ খুব সুন্দর। আর সেই আকাশ-বাতাস পূর্ণ করে আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর বিচিত্র শব্দ। কামানের মুহুর্মুহু গর্জন, ভারী মেশিনগানের কটকট আওয়াজ, ছোটো আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর পাখি উড়ে যাওয়ার মতো মৃদু ফর্‌ড়র্‌র্‌ শব্দ। নিশ্চয়ই এসব বৃথা যাচ্ছে না। মানুষের রক্ত ঝরছে। হৃৎপিণ্ড ফুসফুস বিদীর্ণ হচ্ছে, মাথার খুলি চূর্ণ হচ্ছে, হাড় ফেটে যাচ্ছে প্রচণ্ড শব্দে। হাতের জোড় খুলে যাচ্ছে। দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে উড়ে যাচ্ছে শরীরের এক একটা অঙ্গ—হাত বা পা বা মাথা। থেঁতো হয়ে যাওয়া ইঁদুরের মতো বিদেশের মাটিতে মুখ গুঁজে চিরকালের জন্য শুয়ে পড়ছে সৈন্যরা।

আস্তে আস্তে ফিরে এসে আমিও মাটিতে পাতা মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হয়ে মড়ার মতো ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যাই।

যুদ্ধ চলে গেছে দক্ষিণে। কাল সারারাত ধরে দেখেছি আকাশে হাউইবাজি আর শুনেছি নানারকম আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ। সেসব অস্ত্র চিনি না। কেমন দেখতে তার কোনো ধারণা নেই। সকালে আমার সারা শরীর পালকের মতো হালকা। মাথার ভেতরটা ফাঁকা। হাঁটতে গেলেই ভারসাম্য হারিয়ে টলতে থাকি, পা ফেলবার আগেই পা উঠে পড়ে হুশ করে। মাথার মধ্যে কোনো চিন্তা নেই—শুধু এই বোধ—আঃ, যুদ্ধ চলে গেছে দক্ষিণে—এখান থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে। যে জায়গাটায় আছি সেটা এখন মুক্ত—আসন্ন অবধারিত বিজয়ে মানচিত্রে যে নতুন রাষ্ট্র জন্ম নেবে, যার নাম হবে বাংলাদেশ তার সঙ্গেই যুক্ত হবে এই অঞ্চল। পাকিস্তানিরা পিছোচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে। আর কতোদূরে যাবে তারা। 'দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে টেরাই' মনে পড়ে। হাজার হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের মৃতদেহ বঙ্গোপসাগর ধরে ভেসে যাবে। তাই ঘটবে বলেই যেন শেষবারের মতো তারা ফিরে দাঁড়িয়েছে ফুলতলা থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে—শিরোমণিতে।

বাড়িতে ফিরে এসেছি সকাল দশটায়। এখন রাত দশটা। আমাদের পুরনো পলেস্তরা-খসা ফাঁকা বাড়ির ঠাণ্ডা চকচকে মেঝেয় বিছানা করে গরম লেপ-কম্বল গায়ে দিয়ে ছেলেমেয়েরা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। আমি মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছি খোলা আকাশের তলায়। দক্ষিণ দিকের আকাশ আলোয় আলোয় শাদা। বিকট শব্দে কামানের গোলা ছুটছে। বাতাসহীন স্তব্ধ রাতের পাথর-ভারি নির্জনতায় স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তবলা-লহরায় দ্রুত তালের বাজনার মতো। বিশাল দিঘির কথা মনে পড়ে। তার উপর গ্রীষ্মের বড়ো বড়ো ফোঁটার বৃষ্টির শব্দ যেন কানে আসে। যেন ধান কেটে-নেয়া জমির নাড়ার আড়াল থেকে শত শত গুড়ুল পাখি ফর ফর

শব্দে উড়ে গেল। কিছুতেই উপলব্ধিতে আসতে চায় না যে, যে সমস্ত আগুনে-লাল লোহার গোলা, হাজার হাজার তপ্ত সিসের টুকরো চারদিকে তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে সেগুলো তরমুজে যেমন ছুরির ফলা, মানুষের শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। লাশ পড়ছে। জীবিতেরা শুয়ে পড়ছে চিরদিনের মতো।

যে ভারতীয় কামানের দূরাগত গর্জন শুনে দুদিন আগে দুপুরবেলায় সপরিবারে বাড়ি ছেড়েছিলাম—মনের মধ্যে এই প্রত্যয় দৃঢ় ছিল যে ঐ কামানের মুখ কয়েক ইঞ্চি নিচু করার অপেক্ষা মাত্র, তাহলেই ভেঙে যাবে আমাদের এই পুরনো বাড়ির উঁচু ভিত। যুদ্ধ যখন সরে গেল, বাড়ি ফিরে এসে দেখি আমাদের বাড়ি থেকে কয়েক শো হাত দূরে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে এক জোড়া কামান বসানো হয়েছে। দুটিরই নল আকাশমুখো। মুহূর্তে মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে এক জোড়া গোলা বেরিয়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে। প্রত্যেকবার মাটি কেঁপে উঠছে—কেঁপে উঠছে ভিতসুদ্ধ আমাদের বাড়ি। কিন্তু আশ্চর্য মানুষের স্নায়ু। ঘণ্টা দুই অসম্ভব অতিষ্ঠার মধ্যে কাটলো। কখন বন্ধ হবে এই কামান গর্জন? কিন্তু ঘণ্টাদুয়েক সময় কেটে যাওয়ার পরেই আর কানে আঘাত করে না এই শব্দ। চারদিকে যে স্বাভাবিক নানা শব্দ আমরা শুনতে পাই কিন্তু খেয়াল করি না, কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না কোনো কাজের—পাখির কিচির-মিচির, গরুর ডাক, কুকুরের চিৎকার, ঝনঝন শব্দে থালা-বাসন পড়ে যাওয়ার শব্দ—এই রকম স্বাভাবিক শব্দের সঙ্গে মিশে গেল কামানের আওয়াজ। দেখছি বাচ্চাদের ঘুমের একটুও ব্যাঘাত হচ্ছে না।

এলাকাটা ভারতীয় সৈন্যে ভরে গেল। লুঙ্গি পরা, গেঞ্জি গায়ে, রাইফেল হাতে, দু'চারজন পরিচিত স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গেও দেখা হচ্ছিল মাঝে মাঝে। তারা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যুদ্ধের গল্প করছিল, তার পরে হয়তো ফিরে যাচ্ছিল নিজেদের বাড়িঘরের দিকে। কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর একেবারে পেছনের দিকটা ভরে ফেললো আশপাশের সমস্ত খালি জায়গা। তাদের সবজেটে পোশাক, রুক্ষ কালো ধুলোমাখা চেহারা। কাঁধে ঝুলোনো আগ্নেয়াস্ত্র আর শক্ত কঠিন বুটজুতো থেকে এমন একটা কঠোর নির্মম জীবনযাপনের চিহ্ন

ফুটে ওঠে যে ওদের সামনে দাঁড়াতেও বুক কেঁপে যায়। চেহারা থেকে বোঝা গেল, ভারতের নানা প্রদেশের মানুষ তাদের মধ্যে আছে। মাথায় পাগড়ি পাঞ্জাবি শিখ যেমন আছে, একই চেহারার পাঞ্জাবি হিন্দুও তেমনি আছে। ঘন কালো রঙের হরিয়ানার পাঞ্জাবি হিন্দু এই আমি প্রথম দেখলাম। অন্ধ্রের সৈন্যই যেন বেশি ছিল এ দিকটায়। যেখানে সেখানে ওদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ঝোপের আড়ালে দশজন, গাছের নিচে বিশজন। বাতাসে বিটকেলে বোটকা গন্ধ। তার সঙ্গে মিশে রয়েছে পোড়া ডালদার সুবাস। আসলে সেনাবাহিনীর এই অংশটা রসুইয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত—ফ্রন্টে যারা যুদ্ধ করছে তারা আছে শিরোমণিতে। প্রথম দিনের সন্ধের দিকে কয়েকজন আমাদের বাড়িতে এসে রান্নার তৈজসপত্র ধার চাইল। বাড়িতে যা ছিল সব বের করে দেওয়া গেল। স্টেনলেসের থালা গ্লাস, বাটি, এনামেলের হাঁড়িপাতিল। ধার হিশেবে নয়, চিরদিনের জন্যই দেওয়া গেল। দুঃখ করা বৃথা। বেশির ভাগ সেপাইয়ের পিঙ্গল চোখের দিকে তাকানো কঠিন। একটা ভয়ানক পাশব দৃষ্টি যেন আমাদের ভিতরটা পর্যন্ত লহমার মধ্যে দেখে নিচ্ছে। সকালের দিকে দেখা হয়েছিল ফর্শা, প্রায় বাঙালি মিষ্টি চেহারার এক কেরালার সৈনিকের সঙ্গে। সে আমাকে ইংরেজিতে জিগ্যেস করলো, 'আর ইউ এ মোসলেম?' বললাম, 'ইয়েস, আই এ্যাম এ বেঙ্গলি মোসলেম।' শেষের কথাটা জোরের সঙ্গে বলেছিলাম এ দাবি করতে পারব না। কোথায় একটা ভয় আর অবিশ্বাস কাজ করছিল। তার হাতে অপেক্ষমাণ সীসেয় ভরা রাইফেল। বিচিত্র ভাষার, বিচিত্র সংস্কৃতির মানুষ। একেবারে বাঙালির মতোই দেখতে বটে, কিন্তু ওর কিছুই আমি চিনি না। কঠিনমুখে সে বললো, 'আই সি। হোয়াই ডিড্ ন্‌ট ইউ গো টু ইন্ডিয়া?' তখন আমি দুপায়ের ওপর শক্ত করে দাঁড়িয়েছি, বললাম, 'বিকজ আই ডিড্ নট্ ওয়ান্ট টু, মাই ওল্ড পেরেন্টস আর উইথ্ মি। আই কুড নট হ্যাড্ গন্ টু ইন্ডিয়া ইভন ইফ আই ওয়ান্টেড টু গো। লোকটা তেমনিই কঠিনমুখে আর একবার বললো, 'আই সি—' বলে চলে গেল।

অবিরাম কামান দুটি মাটি কাঁপিয়ে গর্জন করে চলেছে। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি নল দুটির মুখ কখনো কখনো দুচার ডিগ্রি নামিয়ে আনা হচ্ছে, কখনো দেয়া হচ্ছে খানিকটা উপরে তুলে। রাতের

ঘুম স্বস্তি-অস্বস্তিতে ভরা। ঘুম ভেঙে গেলে অনেকক্ষণ মাথা কোনো কাজ করে না। কোথায় আছি, কাদের ঘর, পাশের মানুষগুলো কারা, দরজা কোনদিকে সমস্ত গোলমাল পাকিয়ে যায়। ধীরে ধীরে, অনেকটা সময় নিয়ে বোধ ফিরে আসে। ঘরের ভিতরের ঝাপসা ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রান্না করার তৈজসপত্রগুলো ফিরে পাওয়ার কোনো আশাই ছিল না। সেদিন সকালে ঘুম ভাঙে খুব সকালে। পুবের বারান্দায় লম্বা তেরছা শীতের সকালের সূর্যের আলো এসে পৌঁছেছে মাত্র, চেয়ে দেখি আমাদের দেয়া প্রতিটি থালা বাসন হাঁড়ি পাতিল ঝকঝকে করে মেজে দেয়ালের গায়ে সার দিয়ে রাখা আছে। একটি জিনিশও খোয়া যায় নি, একটি জিনিশও নোংরা নয়। রাতের রান্নার কাজ সেরে নিয়ে সেপাইরা পাত্রগুলো ধুয়ে-মুছে ভোর রাতেই ফেরত দিয়ে গেছে। একটু আশ্চর্যই হয়ে গেলাম।

বেলা আর একটু বাড়লে রোদে-ভরা বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে আমরা বসে আছি। এসে হাজির হলো এক পাগড়ি-পরা কালো শিখ। শরীরটা একটু হালকা, কালো, কাঁধে যথারীতি রাইফেল। সামান্য অস্বস্তিতে পড়েছি—লোকটা কাছে এসে বললো, 'নমস্তে।' আমি হিন্দি প্রায় বলতেই পারি না, এ লোকটা ইংরেজিতে কথাবার্তা চালাতে অপারগ। আলাপটা চালিয়ে যাওয়া আমার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছিল। তাছাড়া অস্বস্তি তো আছেই। কিন্তু লোকটি একটুও দমলো না। একটানা হিন্দিতে কথা চালিয়ে গেল। বারান্দার আর একদিকে ইজিচেয়ারে বাবা বসে ছিলেন। লোকটি বললো, 'আমি পাঞ্জাবি হলেও শিখ নই, হিন্দু।' বাবার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিগ্যেস করলো, 'উ কৌন? আপকা পিতাজী?' আমি মাথা ঝুলিয়ে হ্যাঁ বলতেই লোকটা সোজা উঠে গিয়ে বাবার কাছে গিয়ে 'নমস্তে' বলে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। আমি তখন এত অবাক হয়ে গেছি যে তাকে একটি কথা বলতে পারলাম না। সে বাবার কাছে আরও দু'এক মিনিট দাঁড়িয়ে কুশল জিগ্যেস করে আমাদের কাছে ফিরে এসে বললো, তারও বাবা আছে। আমার বাবাকে দেখে তার একই বয়সের বাবার কথা মনে পড়েছে।

এই বিবরণ আস্তে আস্তে রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালার মতো হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি কিন্তু কিছু করার নেই। বিকেলের দিকে লোকটা আর একবার ফিরে আসে। পাকা আমের রসে ভরা একটা কৌটো এনে আমার দু'বছরের মেয়েটির হাতে গুঁজে দিয়ে যায়। ভাষার অভাবে এই সৈনিকটির সঙ্গে বেশি কথা বলতে পারি নি। শুধু এইটুকু বুঝেছি, মানুষ পাথর হলেও হতে পারে, কিন্তু তাকে নিংড়াতে পারলে রস বের হওয়া অসম্ভব নয়।

বিকেলে বাজারের দিকে গিয়েছি। মোড়ের কাছে আসতেই দেখি উল্টোদিক থেকে একটি জলপাই সবুজ ভারতীয় ভ্যান তীব্র বেগে এগিয়ে আসছে। এই গতির মধ্যেই বাজারের চৌমাথায় পৌঁছে কড়া ব্রেক কষে সেটা দাঁড়িয়ে গেল। খটখট শব্দে দশ-বারোজন ভারতীয় সেপাই কংক্রিটের রাস্তায় নেমে একটি জ্বালানি কাঠের দোকানের দিকে ছুটলো। কিছু বোঝার আগেই দেখি দোকানে ঢুকে তাদের দু'একজন উত্তেজিতভাবে হাত-পা নেড়ে দোকানের মালিকের সঙ্গে কী যেন বলছে, অন্যেরা এক একটা চেলা-কাঠ হাতে নিয়ে সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই বেধড়ক পেটাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল বাজারের মধ্যে। লোকজন মার খাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছে না, ছুটোছুটি করছে আর্ত চিৎকার করতে করতে। আমার অসহ্যবোধ হলো। ভ্যানের কাছে গিয়ে দেখি সামনের সিটে চোখে কালো চশমা লাগিয়ে একজন অফিসার বসে আছে। নির্বিকার মুখ তার। আমি তাকে জিগ্যেস করলাম, তোমাদের লোকেদের হঠাৎ এই অন্যায় আচরণের কারণ কী? যাদের এমন নির্মমভাবে পেটানো হচ্ছে তাদের অপরাধটা কী? অফিসারটি চশমা খুলে আমার দিকে তাকালে আমি দেখলাম সে তখনো পুরোপুরি যুবক হয়ে ওঠে নি। বারবার সে বললো, 'আই অ্যাম সরি, ভেরি সরি, সাম টোয়েন্টি ফোর মেন—অল দেয়ার রিলিটিভ্‌স—হ্যাভ সাকাম্বড টু দেয়ার ইনজুরিস লাস্ট নাইট। দে হ্যাভ টু বি বার্ন্‌ট টু ডে। উই হ্যাভ কাম টু বাই সাম ফুয়েল টু বার্ন দেম।' ওদের মনের অবস্থা বিবেচনা করে বারবার তাদের মাফ করে দিতে অনুরোধ করলো অফিসারটি।

এতক্ষণে লোকজন ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে। আমি দেখলাম দোকানের মালিক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লোকজনকে বলে প্রচুর সুন্দরী কাঠ দিয়ে ভ্যান প্রায় ভর্তি করে দিল। ভ্যানটা যেমন এসেছিল তেমনিই আবার ফিরে গেল শিরোমণির দিকে।

সুন্দরী কাঠ টকটকে লাল। সেজন্য সুন্দরী কাঠের আগুন আরো লাল কিনা জানি না। ভারতের কোথাকার কোন্ প্রদেশের মানুষ, হয়তো তামিল, হয়তো রাজস্থানি, হয়তো মারাঠি, হয়তো বাঙালি—সম্পূর্ণ অজানা এক ভূখণ্ডে ভৈরব নদের তীরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে পঞ্চভূতে মিশে যাবে। মানুষ যা কিছু দেয় তার সবই সম্পূর্ণ নিরর্থক উদ্ভট অবাস্তব কিনা এই প্রশ্ন এখন আমাকে ভীষণ তাড়া করে ফেরে।

সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র চুপ করে গেছে। দশই কি এগারোই ডিসেম্বর শিরোমণির যুদ্ধ শেষ। ফুলতলার এদিকটা একেবারে শান্ত। ভারতীয় বাহিনীর পেছনের অংশটা ফুলতলা ছেড়ে আরো সামনের দিকে চলে গেছে। কামানগুলোও থেমেছে। মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের দেখি দীপ্তমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরনে সবুজ লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, কাঁধে রাইফেল। আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ বলতে এরাই মাঝে মাঝে রাইফেল চালাচ্ছে আকাশমুখো। তীব্র শিস দিয়ে বাতাস কেটে বুলেট ছুটে যাচ্ছে। কী করে ছুড়তে হয় গুলি দেখার জন্য ওদের হাত থেকে রাইফেল নিয়ে আনাড়ি হাতে ট্রিগার টানছে কেউ।

হি হি করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে মানুষ। রোদে, তাতে, বৃষ্টিতে পোক্ত মুক্তিযোদ্ধার তামাটে মুখে সরল হাসি। হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে মানুষের ভিড়। খণ্ড খণ্ড বিজয় মিছিল আপনাআপনি তৈরি হয়ে উঠছে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের তখনো বাকি। রাজাকার-আলবদরদের চৌদ্দ ডিসেম্বরের দুষ্কর্ম কারো কল্পনায় নেই। মানুষজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জমছে গ্রামের মাঝখানে। স্কুলের মাঠে বা মসজিদ-মন্দিরের উঠোনে। সেখান থেকে চলে আসছে হাটেগঞ্জে। আশ্বস্ত উদ্‌গ্রীব চেহারা তাদের। নয় মাসের নরকবাসের চিহ্ন তাদের শরীরে। যার কোথাও আঘাত লাগে নি, তারও ভেতরে একটানা যে আগুন জ্বলেছে তাতেই পুড়ে কালো হয়ে গেছে তার শরীর। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে তারা। জড়িয়ে ধরে পরখ করার চেষ্টা করছে অন্যেরা বেঁচে কিনা, নিজেরা বেঁচে আছে কিনা, হাত বুলিয়ে দেখতে চাইছে রোদ সত্যি কিনা, গাছপালা-মাটির অস্তিত্ব আছে কিনা, শরীরে পানির ছোঁয়া অনুভব করা যায় কিনা। মানুষের উত্তাপে বাজারের জিনিশপত্রগুলো পর্যন্ত ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। ভৈরব নদের পাড়ে গিয়ে আমি কতোদিন পরে জোয়ার-ভাটা দেখতে পাই। নদী ভেতর থেকে ফুলে উঠেছে। তারপর ভাটার টানে শব্দ করে নেমে যাচ্ছে সাগরের দিকে। বাজারে ঢুকতেই দেখা যায় চৌমাথায় সুপারি গাছটা এখনো পোঁতা রয়েছে। ঐ গাছে দড়ি দিয়ে সাতদিন ঝোলানো ছিল শহীদ রফির মাথা।

শিরোমণি যুদ্ধের এলাকায় আমি একবার যেতে চাইছিলাম। যুদ্ধ থেমে গেছে। সৈন্যরা চলে গেছে ওখান থেকে। সৈন্যদের ভিড় এখন দৌলতপুর থেকে খুলনায়। পাকিস্তানি সৈন্যদের নিরস্ত্র করা হচ্ছে, নিরাপত্তার জন্য বিহারিদেরও আলাদা করে ফেলা হচ্ছে। এখানে-সেখানে একটি-দুটি প্রাণ নিচ্ছে সিসের বুলেট। আক্রোশেই প্রাণ যাচ্ছে কারো। বিচারের রাস্তা লম্বা। প্রাণ যখন নিতেই হবে, অনেক প্রাণ নেয়ার অপরাধে যে অপরাধী তাকে যখন সামনে পাওয়া গেছে, তখন কাজটা খুব সংক্ষেপে মুহূর্তের মধ্যে করাটাই ঠিক। নৃশংসতম নরঘাতকেরও চোখের দিকে চাইলে, বাঁচার কামনা তার দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হতে দিলে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, তার নিজস্ব গল্পটি একবার শুনতে শুরু করলে প্রাণ নেয়া খুব কঠিন। এই কঠিন রাস্তায় না গিয়ে হাউয়ের মতো উড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল কিছু প্রাণ। মানুষের জমাটবাঁধা কান্না বিজয় উৎসবে আছড়ে পড়ছে। কী

ভয়ানক তিক্ত অশ্রু মানুষের চোখে।

শিরোমণির দিকে কোনো যানবাহন যাচ্ছিল না। খুলনা থেকে যশোর হয়ে নানা রাস্তায় যেসব বাস যাতায়াত করতো সেসব বন্ধ আছে অনেকদিন। গত এক সপ্তাহ রাস্তা রয়েছে সেনাবাহিনীর দখলে। আমি যেতে চাইলেও খুলনার দিকে যাওয়ার উপায় নেই। বোধহয় বারো তারিখের বিকেল তিনটার দিকে একটা পুরনো, ভাঙা, বেতো, ফুলতলা-খুলনার লোকাল বাস অনেক সাহস করে খুলনার দিকে যেতে রাজি হলো। ড্রাইভার ছেলেটিকে আমি চিনি, অসম্ভব বেপরোয়া। বাস সে রাস্তার বাইরে চালাতেই বেশি পছন্দ করে। কিন্তু আমি জানি লরঝরে বাসটিকে নিয়ে সে তেমন কিছু করতে পারবে না।

শিরোমণির কাছে এসে আমি ছেলেটিকে আস্তে বাস চালাতে বলি। সামনের কালভার্টটি উড়ে গেছে, রাস্তায় একটা বিরাট গর্ত। বাঁ দিকে একটি ঘন বাঁশবাগান। জায়গাটা দিনের আলোতেও অন্ধকার থাকতো। দেখি অতবড়ো বাঁশবন তছনছ হয়ে গেছে। পাকা বাঁশের মাথাগুলো থ্যাতা হয়ে পাকানো দড়ির মতো ঝুলছে। মাঝখানে ভেঙে দু'ভাগ হয়ে গেছে। গোড়াসুদ্ধ উপড়ে শূন্যে দুলছে মোটা মোটা বাঁশের গুঁড়ি। বাজারটা বাদ দিলে চারদিকে ফাঁকা মাঠ। একেবারে ফুটিফাটা হয়ে আছে। সমস্ত মাঠ জুড়ে অসংখ্য ট্রেঞ্চ, কাঁচা মাটি উঁচু হয়ে রয়েছে। বাজারে ঢুকতেই দেখা গেল রাস্তার উপরে বাসের সামনে পড়ে রয়েছে এক দাড়িওলা বাউলের লাশ। হাতের দোতারাটি ছিটকে পড়েছে হাত দশেক দূরে, লুঙ্গি-পরা ছেঁড়া জামা গায়ে লোকটি হাঁটু ভাঁজ করে নিশ্চিন্তে পড়ে আছে রাস্তার উপরে। ওকে পাশ কাটিয়ে বাস এগোতেই চোখে পড়ে, বাজারের একটি বাড়িও আস্ত নেই। দেয়াল ভেঙে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে বেশ বড়ো একটি দোতলা বাড়ি। দেয়ালের ওপর দেয়াল—সব ভেঙে এক জায়গায় স্তূপাকার হয়ে আছে। আঘাতের প্রচণ্ডতায় ইট গুঁড়িয়ে মিহি লাল ধুলো সমস্ত ধ্বংসস্তূপটিকে ঢেকে দিয়েছে। মেলে-দেয়া শাড়ির মতো বড়ো একটি বারান্দা ঝুলে আছে, হাড়-পাঁজরের মতো বেরিয়ে এসেছে লোহার রডগুলো। বাউন্ডারি পাঁচিলগুলোয় বড়ো বড়ো ফুটো। কোথাও একটি জনপ্রাণী নেই। শীতের বিকেলের আলোয় এই বিরাট লণ্ডভণ্ড এলাকাটিকে আমাদের চেনা পৃথিবীর অংশ বলেই মনে হচ্ছিল না।

বাজারটা যখন প্রায় পেরিয়ে এসেছি তখন দেখতে পেলাম রাস্তার কিনারায় দুটি পাকিস্তানি সৈন্যের লাশ। তাদের শরীরে জওয়ানের পোশাক। স্বাস্থ্যে মাংসে পরিপুষ্ট দুটি বিশাল শরীর, ছোটো করে চুল ছাঁটা, খুব অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। একটু দূরেই মোটাসোটা একটি কালো দেশি কুকুর। এর মধ্যেই হাওয়া-ভরা থলের মতো ফুলে উঠেছে তার দেহ। তখন আশপাশে দেখতে পাই, রাস্তার কিনারায়, ঢালু জায়গাগুলোতে, রাস্তার নিচের চকচকে ঠাণ্ডা কালো পানির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষ, গরু-ছাগল-কুকুরের লাশ।

আরো দূরের মাঠের দিকে চেয়ে আমার গা শিরশির করে ওঠে। সমস্ত মাঠে ইতস্তত অসংখ্য মানুষ গরু-ছাগল মরে পড়ে রয়েছে। ট্রেঞ্চগুলোর গায়ে দু'চারজন পাকিস্তানি সৈন্য বসে আছে। হয়তো উঠে এসেছিল ট্রেঞ্চ থেকে, পালাবে বলে কিংবা উঠে এসে আত্মরক্ষার জন্য লড়বে বলে—এখানেই মারা পড়েছে—তারপর শক্ত হয়ে গিয়েছে শরীর। আমি দেখতে পাচ্ছি না, নিশ্চয়ই ট্রেঞ্চগুলো ওদের মৃতদেহে ভরা। প্লেগের ইঁদুরের মতো মরে গাদা হয়ে আছে। বিরাট একটি মাঠে এইভাবে ছিটানো মৃতদেহ দেখা কী এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা কঠিন। মৃত্যুর বীভৎসতা এখন আর নেই। প্রতিটি মৃত্যুর সঙ্গে অশেষ যন্ত্রণা থাকে। শারীরিক যন্ত্রণা তো থাকেই—চেতনাহীনতার মধ্যে মৃত্যু এলে বা বিদ্যুতের মতো তীব্র গতিতে মৃত্যু তার কাজটুকু করে গেলে অবশ্য কথা নেই; কিন্তু বুদ্ধি আর চেতনা সক্রিয় থাকলে মৃত্যুর মুহূর্তে শারীরিক যন্ত্রণার পাশাপাশি আত্মিক সঙ্কটেও মানুষ ছিন্নভিন্ন হয়। নিজের রক্তে নিজে ভেসে যেতে যেতে, শরীর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া নিজের হাত বা পা দেখতে দেখতে অমোঘ মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কেমন বোধ করে মানুষ? শিরোমণির মাঠ যুদ্ধের রাতে-দিনে আক্রোশ, শোচনা, কষ্ট, হতাশা, ক্ষতির আর্তনাদে পরিপূর্ণ ছিল। এখন এই মাঠ এমন ভয়ানক নিস্তব্ধ যে মনে হয় মৃত্যুও একে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। খোলা প্রান্তরে তাকালে দেখা যায় কোথাও মাটি উঁচু হয়ে আছে, শুকনো মরা কোনো গাছের গুঁড়ি উবু হয়ে পড়ে রয়েছে, কোথাও আটকে আছে পানি, কোথাও দেখা যাচ্ছে উই টিবি বা ঘন ঝোপ-জঙ্গল বা শ্যাওলার শুকনো গাদ। এদেরই সঙ্গে মিশে গেছে পাকিস্তানি সৈন্যদের লাশ। মৃতদেহের সজীবতা হারিয়েছে তারা। মৃতের সামনে দাঁড়ালে তা অশ্রু

টেনে আনে, স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, নীরব হাহাকারে বাতাস ভারি করে দেয়। কিন্তু পাকিস্তানিদের এসব লাশ প্রকৃতির বর্জ্য পদার্থের মতোই এই মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে পড়ে আছে—যেন উই ঢিবি, যেন শুকনো শ্যাওলার গাদা, যেন পেছন-উল্টানো মরা গাছের গুঁড়ি। কেউ তাদের শেষ বিদায় জানায় নি। যেমন কুকুরটি মরে এখন তাড়াতাড়ি ফুলে উঠছে, শোক নেই, অশ্রুর অভিষেক নেই, ঠিক তাই ঘটেছে পাকিস্তানি সৈন্যদের ভাগ্যে।

বাসটা এতক্ষণ আমারই অনুরোধে থেমে ছিল। সদ্য পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্র দেখা আমাদের কারো অভিজ্ঞতায় নেই। ড্রাইভার ছেলেটি শুধু আমার কথাতেই গাড়ি থামিয়েছিল সেটা ঠিক নয়। তার নিজের আগ্রহ কম ছিল না। সামান্য যে কয়েকজন যাত্রী ছিল বাসে, তারাও নেমে গিয়েছিল। বাস আবার চলতে শুরু করলে ড্রাইভার আর যাত্রীরা খুব নিষ্ঠুর অশালীন রূঢ় ভাষায় নিজেদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে লাগলো।

বাসের লোকজনের কথা আর আমার কানে ঢোকে না। জনহীন ঘরবাড়ি গাছপালা মাঠ প্রান্তরের ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে বাস চলতে থাকে। শীতের সন্ধ্যায় অন্ধকারও তাড়াতাড়ি নেমে আসে। আমার মনে হতে থাকে জীবন-মৃত্যু দুই-ই এই অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু সন্ধের মুখে দৌলতপুরে ঢুকতেই দেখা যায় রাস্তায় লোক ভরা। পথের মোড়গুলোতে লোকজন গিজগিজ করছে। ভারতীয় সৈন্যদের দেখা যাচ্ছে এদিক-ওদিক। বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ছে মাঝে মাঝে। প্রচণ্ড হুল্লোড় আর বিস্ফোরণের আওয়াজে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। এর মধ্যেই কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে আমাদের ছোট্ট বাসাটির সামনে এসে দাঁড়াই। সঙ্গে চাবি ছিল। যাওয়ার সময় বাড়িতে তালা দিয়ে চাবি নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। এখন দেখছি বিনা কারণে চাবি এনেছি। দরজা হাট করে খোলা। ঘরের মধ্যে ঢুকে সুইচ টিপতেই আলো জ্বলে উঠলো। যাক, বিদ্যুতের লাইন নষ্ট হয় নি। সবগুলো ঘরের আলো জ্বালিয়ে দেখি কোনো জিনিশই খোয়া যায় নি। বিছানার নিচে ছিল আমার একটি পুরনো দোনলা ইংলিশ বন্দুক। সেটা যেমন রেখে গিয়েছিলাম তেমনিই আছে। শুধু মেঝে আর বিছানার ওপর দেখতে পাই মোম জাতীয় কোনো পদার্থ মাখানো গাদা গাদা সরু শাদা পাটকাঠির মতো জিনিশ। মেঝে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে এগুলো দিয়ে। বুঝতে পারলাম না কী হতে পারে। তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখি, বস্তাখানেক

চাল ছিল রান্নাঘরে, সেটা নেই আর নেই কোনো খাবার জিনিশ। উঠোনের এক কোণে কলাগাছের ঝাড়ে একটি গাছে ছিল এক কাঁদি কাঁচকলা। কলাগুলো আধখানা করে কেটে নেয়া হয়েছে। ঘুরে ঘুরে আর কোনো ক্ষতির চিহ্ন আমি দেখতে পেলাম না। কী খেয়াল হলো হাতে করে কয়েকটি ঐ পাটকাঠি জাতীয় জিনিশ নিয়ে আমি উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। পকেটে দিয়াশলাই ছিল, একটা কাঠি জ্বালিয়ে ওতে ঠেকাতেই হুস করে একটা শাদা আলো গোখরোর ছোবলের মতো আমার হাতে এসে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম এই অতিশয় দাহ্য পদার্থগুলো কী জন্য ঘরের মেঝেয় গাদা করা আছে। বাড়িটিতে পলাতক পাকিস্তানিরাই ছিল। ভয়ে আধমরা এই সৈন্যদের লুটপাটের দিকে মন দেয়ার উপায় ছিল না। ক্ষুধার্ত পশুর মতো চাল-ডাল আর কাঁচকলা খেয়েছে। সামান্য অজুহাতে বাড়িটাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়ার জন্যই সঙ্গে এনেছিল ভয়ানক দাহ্য কাঠিগুলো। এই কাজটি করার আগেই বাড়ি ছাড়তে হয়েছে তাদের। কলেজে অধ্যক্ষ ফিরে এসেছেন। কিছু কিছু অধ্যাপক ও কর্মচারীও নিজেদের বাসায় এসেছেন। শোনা গেল, একজন ভারতীয় মেজর কলেজের নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন।

কোনো কিছু না খেয়ে, আলো না জ্বালিয়ে, দরজা বন্ধ করে আমি নোংরা খাটে শুয়ে পড়ি। সমস্ত বাড়িতে আমি একা। জানালা দিয়ে রাতের আকাশ দেখা যাচ্ছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধতা বাড়ছে, তার গায়ে আছড়ে পড়ছে অনেকদূর থেকে আসা মানুষের উল্লাসের গর্জন। তীব্র কড়াৎ শব্দে ফেটে পড়ছে রাইফেলের আওয়াজ। সান্ত্বনাহীন বিশ্রামহীন ঘুমে আমার দু'চোখের পাতা জড়িয়ে আসে, আবার জেগে উঠি, অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকি, ফেলে আসা নয়টি মাসের ছবি শরীরী বাস্তবতা নিয়ে ফিরে আসে—তাতে ধারালো পাথুরে খাঁজগুলো স্পষ্ট অনুভব করতে পারি—কী সাংঘাতিক ছায়া আর পানির অভাব তাতে—আবার ঘুম আসে—বৃক্ষহীন পাথুরে পাহাড়ের গা বেয়ে হিম অতলের দিকে নেমে যেতে থাকি, ঘুম ভেঙে যায়, তপ্ত অশ্রুর স্রোত চোখের কোণ বেয়ে তেলচিটে নোংরা বালিশটা ভিজিয়ে দেয়, হঠাৎ ক্রোধে মাথার তালু জ্বলে ওঠে, দুহাতে মাথা চেপে উঠে বসি।

কেউ কোনো উত্তর দেয় না।